بسم الله الرحمن الرحيم

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم
اَصْحَابِیْ كَالنُّجُوْمِ بِاَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রিয়
অতি উচ্চ মর্যাদাবান সাহাবী

হযরত আমীর মু‘আভিয়া

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু]

লেখক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান
মহাপরিচালক, আনজুমান রিসার্চ সেন্টার

প্রকাশনায়

আনজুমান-এ রহমানিয়া আহমদিয়া সুন্নিয়া ট্রাস্ট

[প্রচার ও প্রকাশনা বিভাগ]

৩২১, দিদার মার্কেট (৩য় তলা দেওয়ান বাজার, চট্টগ্রাম-৪০০০, বাংলাদেশ। ফোন : ০৩১-২৮৫৫৯৭৬,
E-mail:anjumantrust@yahoo.com, anjumantust@gmail.com
www.anjumantrust.org

আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রিয়
অতি উচ্চ মর্যাদাবান সাহাবী

হযরত আমীর মু‘আভিয়া

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু]

লেখক
মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

প্রকাশকাল
১২ রবিউল আউয়াল শরীফ, ১৪৩৮ হিজরী
২৯ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বাংলা
১৩ ডিসেম্বর, ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ

প্রস্তুতকরণে
আনজুমান রিসার্চ সেন্টার
আলমগীর খানক্বাহ্ শরীফ
ষোলশহর, চট্টগ্রাম।

হাদিয়াঃ ৫০/- টাকা মাত্র

HAZRAT AMEER MU'AVIA RADHIALLAHU TA'ALA `ANHU, WRITTEN BY **MOULANA MUHAMMAD ABDUL MANNAN**, PUBLISHED BY **ANJUMAN-E RAHMANIA AHMADIA SUNNIA TRUST.** CHITTAGONG, BANGLADESH. **HADIAH TK. 50/-** ONLY.

সূচীপত্র

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম
নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লী ওয়া নুসাল্লিমু 'আলা রসূলিহিল করীম
ওয়া 'আলা- আ-লিহী ওয়া সাহবিহী আজমা'ঈন

মুখবন্ধ

হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু

অতি উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবী। আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তাঁকে ভালবাসেন

প্রতিটি ব্যক্তি যা বস্তুর আসল অবস্থা ও প্রকৃতি যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে কিংবা যথাযথ পন্থায় সে সম্পর্কে জেনে নিয়ে ওই ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অন্যথায় ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অনিবার্য। সিদ্ধান্ত গ্রহণে ওই ভুলের কারণে মানুষ কখনো সীমালংঘনকারী হয়ে যায়। কারণ, কারো কিংবা কোন জিনিষের কোন বিষয় নিজের বোধগম্য না হলে কিংবা নির্বিচারে অপছন্দনীয় হলেই সে ক্ষোভে ও ক্রোধে ফেটে পড়ে আর এ ক্রোধান্বিত অবস্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে সে ভুল করে ও সীমালংঘন করে বসে। তাই, ক্রোধান্বিত ও ইতস্তত: অবস্থায় বিচার কার্য সম্পন্ন করাও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে কিংবা প্রকৃত অবস্থা জেনে নিয়ে, উভয় দিকের দলীল-প্রমাণকে সামনে রেখে অতিরঞ্জন ও শৈথিল্য (ইফরাত ও তাফরীত্ব) বর্জন করে, এ উভয়ের মধ্যবর্তীতে দৃঢ়ভাবে অবস্থান করে নিজে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা অথবা জ্ঞানী ও সুস্থ বিবেক সম্পন্নরা সে ক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা মেনে নেওয়াই অপরিহার্য। আমরা তো মুসলমান। ইহুদীদের সীমালংঘন (ইফরাত্ব) ও খিস্টানদের তাফরীত্ব (শৈথিল্য) অবলম্বন-এর মধ্যবর্তীতে একেবারে সঠিক জায়গায় আমাদের অবস্থান। কারণ, কিতাবুল্লাহ, সুন্নাতে রসূলিল্লাহ, ইজমা'-ই উম্মত ও ক্বিয়াস-ই শর'ঈর আমরা নিষ্ঠাবান অনুসারী।

এ নিবন্ধে আমি হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাবো। হযরত আমীর মু'আভিয়া একাধারে অভিজাত বংশীয়

(ক্বোরাঈশী), শীর্ষস্থানীয় সাহাবী, জ্ঞানী, গুণী, ওহী লিখক, ন্যায়পরায়ণ শাসক, মুজতাহিদ ও মুত্তাক্বী ইত্যাদি। এসব বিবেচনায় তিনি একজন অতীব সম্মানিত ব্যক্তিত্ব। ইসলামের দৃষ্টিতে এবং ন্যায়বিচারের নিরীখে এক ব্যক্তি সম্মান এবং প্রশংসা পাওয়া আর সমালোচনার ঊর্দ্ধে থাকার জন্য শুধু যথেষ্ট নয় বরং অপরিহার্যও। তাঁর চরিত্র এবং কর্মও একেবারে নিষ্কলুষ। তিনি ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান সাহাবী-ই রসূল। বাকী রইলো-হযরত আমীর মু'আভিয়ার উত্তরসূরী ও স্থলাভিষিক্ত পুত্র ইয়াযীদ প্রসঙ্গ। তার চরিত্র, ধর্ম-বিশ্বাস (আক্বিদা), কর্মকান্ড ও ইসলামের নিদর্শনাবলীর প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি বিবেচনায় সে ছিলো মহাপাপী, ধিক্কৃত ও ঘৃণিত ব্যক্তি; অনেকের মতে অভিশপ্ত। এখন প্রশ্ন হলো তার কারণে তাঁর পিতা হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সমালোচনা এবং তাঁর শানে শালীনতা বিবর্জিত মন্তব্য ও আলোচনা বৈধ হবে কিনা? সংক্ষিপ্ত ভাষায় এর জবাব হলো- 'না'। ইয়াযীদের কারণে হযরত আমীর মু'আভিয়ার প্রতি কোনরূপ অসম্মান প্রদর্শন বৈধ ও সমীচিন হবে না। কারণ, তিনি যদি সমালোচিত কিংবা গ্রহণযোগ্যতায় কোনরূপ ত্রুটিপূর্ণ হন, তাহলে একদিকে ইসলামের অনেক মৌলিক বিষয় প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে, অন্যদিকে ওই অসম্মান প্রদর্শনকারী হবে উগ্রতা, বিবেকহীনতা এবং ন্যায়পরায়ণতা-শূন্যতা ইত্যাদি দোষে দুষ্ট এবং গুনাহ্গার। সুতরাং হযরত আমীর মু'আভিয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে অত্যন্ত সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। নিজে সিদ্ধান্তে নেওয়ার আগে মহান সাহাবীগণ সম্পর্কে পবিত্র ক্বোরআনের বাণী কি রয়েছে, খোদ্ রসূল-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আমীর মু'আভিয়াকে ভালবাসতেন কিনা, অন্যান্য সাহাবা-ই কেরাম তাঁকে কিভাবে মূল্যায়ন করতেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন, ওলামা-মাশাইখ এবং শরীয়তের নির্ভরযোগ্য ও বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের সিদ্ধান্ত কি? এ ক্ষেত্রে এসব বিষয়কে প্রাধান্য দেওয়াই হবে নিরাপদ। অন্যথায় মহাবিপদ-তথা অতি অশুভ পরিণতির সম্মুখীন হওয়া অনিবার্য।

সুতরাং আসুন আমরা প্রথমে হযরত আমীর মু'আভিয়া সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানি, তারপর তাঁর বিপক্ষে তথাকথিত অভিযোগগুলোর চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির আলোকে করি।

সুখের বিষয় যে, এ পুস্তকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত ও সপ্রমাণ আলোচনা করা হয়েছে এবং ইসলামের চতুর্দলীলের আলোকে এ প্রসঙ্গে জরুরী পরামর্শও দেওয়া হয়েছে। তাই, আশা করি পুস্তকটা পড়ে পাঠকসমাজ অত্যন্ত উপকৃত হবেন। আল্লাহ্ আমাদের এ প্রয়াসকে ক্বুবূল করুন! আ-মী-ন।

(মাওলানা) মুহাম্মদ আবদুল মান্নান

।। এক ।।

হযরত আমীর মু'আভিয়া

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]র

পরিচিতি

বংশ পরিচয়

তাঁর নাম মু'আভিয়া। কুনিয়াৎ বা উপনাম 'আবূ আবদুর রহমান'। পিতার দিক দিয়ে পঞ্চম পুরুষে এবং মায়ের দিক দিয়েও পঞ্চম পুরুষে তাঁর বংশীয় ধারা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বংশের সাথে মিলে যায়। পিতার দিক দিয়ে তাঁর বংশীয় ধারা নিম্নরূপ-

হযরত আমীর মু'আভিয়া ইবনে হযরত আবূ সুফিয়ান ইবনে হারব ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদুশ্ শামস ইবনে আবদে মান্নাফ।...

সুতরাং হযরত আমীর মু'আভিয়ার বংশ আবদে মান্নাফে গিয়ে হুযূর-ই আক্রামের বংশের সাথে মিলে যায়। সুতরাং বংশগত দিক দিয়ে হযরত আমীর মু'আভিয়া হুযূর-ই আন্ওয়ারের ঘনিষ্ট ও নিকটাত্মীয়। তদুপরি, হযরত আমীর মু'আভিয়া হুযুর-ই আক্রামের শ্যালক। কারণ, উম্মুল মু'মিনীন হযরত উম্মে হাবীবা বিনতে হযরত আবূ সুফিয়ান হযরত আমীর মু'আভিয়ার সহোদরা। এ জন্য মসনভী শরীফে আল্লামা রূমী হযরত আমীর মু'আভিয়াকে সমস্ত মু'মিনের মামা বলেছেন।

হযরত আমীর মু'আভিয়ার জন্ম

আমীর মু'আভিয়ার জন্মতারিখ বা সাল সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোন রেওয়ায়ত পাওয়া না গেলেও হিসেব করে জানা যায় যে, তার জন্ম হুযূর-ই আক্রামের নুবূয়ত ঘোষণায় আট বছর পূর্বে মক্কা মু'আয্যামায় হয়েছে।

কেননা, তাঁর ওফাত হয়েছিলো ষাট (৬০) হিজরীতে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিলো আটাত্তর (৭৮) বছর। হুযূর-ই আক্রামের হিজরত হয়েছিলো নুবূয়ত

ঘোষণার তের বছর পর এবং ওফাত শরীফ হয়েছিলো ১০ম হিজরীতে। এ হিসাবানুসারে হযরত আমীর মু'আভিয়ার জন্ম হুযূর-ই আক্বরামের নুবূয়ত ঘোষণার আট বছর পূর্বে হয়েছিলো।

আমীর মু'আভিয়ার ইসলাম গ্রহণ

সহীহ্ বর্ণনানুযায়ী, হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঐতিহাসিক হুদায়বিয়ার সন্ধির দিনে (৬ষ্ঠ হিজরীতে) ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তা প্রকাশ করেছিলেন ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিন (অষ্টম হিজরীতে); যেভাবে হযরত আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মূলত: ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন বদরের যুদ্ধের দিন; কিন্তু তা প্রকাশ করেছিলেন ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের দিনে। তিনি বদরের যুদ্ধে, মক্কার কাফিরদের পক্ষে গিয়েছিলেন বাধ্য হয়ে। এ জন্য হুযূর-ই আক্বরাম সাহাবা-ই কেরামের উদ্দেশে বলে রেখেছিলেন যেন কেউ হযরত আব্বাসকে হত্যা না করেন।

উল্লেখ্য, হযরত আব্বাস কর্তৃক প্রায় ছয় বছর এবং হযরত আমীর মু'আভিয়া কর্তৃক দু'বছর যাবৎ ঈমানকে গোপন করা অপরাধ নয়। কারণ, তাঁরা বাধ্যগত কারণে ঈমান গোপন করেছিলেন, অথবা তাঁদের তখন জানা ছিলো না যে, ঈমান গ্রহণ করে তা প্রকাশ করাও জরুরী। সুতরাং এতদ্ভিত্তিতে একথাও স্পষ্ট হলো যে, হযরত আব্বাস ও হযরত আমীর মু'আভিয়া 'ক্বদীমুল ইসলাম' অর্থাৎ ইসলামের প্রায় প্রাথমিক যুগের মুসলমান ছিলেন। একথাও সুনিশ্চিত যে, তাঁরা 'মুআল্লাফাতুল ক্বুলূব' পর্যায়ের মু'মিনও ছিলেন না। নও মুসলিমকে গণীমতের মাল প্রদান করে ঈমানের দিকে আকৃষ্ট করা হতো। এমন মু'মিনদেরকে 'মুআল্লাফাতুল ক্বুলূব' পর্যায়ের মু'মিন বলা হয়। বাহরাইন থেকে আগত গণীমত (ফাই) থেকে হযরত আব্বাসকে প্রচুর মাল এবং হুনায়নের যুদ্ধে বিজয়ের পর হযরত আমীর মু'আভিয়াকে একশ' উট ও চল্লিশ তোলা স্বর্ণ প্রদান করা তাঁদের প্রতি হুযূর-ই আক্বরামের দানই ছিলো, 'তা'লীফে ক্বুলূব' (ইসলামের প্রতি উৎসাহ্ দানের জন্য দান) ছিলো না। কারণ, তাঁরা তো এর অনেক আগেই নিষ্ঠার সাথে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত আব্বাস বদরের যুদ্ধের সময় এবং হযরত আমীর মু'আভিয়া হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় ইসলাম গ্রহণ করে মক্কা বিজয়ের সময় তা প্রকাশ্যে ঘোষণা দিয়েছিলেন।

[সূত্র. তাত্বহীরুল জিনান ও আমীর মু'আভিয়া পর এক নযর ইত্যাদি]

প্রশাসক হিসেবে উন্নীত হন

হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা যখন সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করলেন, তখন হযরত আমীর মু'আভিয়ার ভাই ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ানকে সিরিয়ার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। হযরত আমীর মু'আভিয়াও ঘটনাচক্রে তাঁর ভাইয়ের সাথে সিরিয়া গিয়েছিলেন। যখন ইয়াযীদ ইবনে আবূ সুফিয়ানের মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন ইয়াযীদ হযরত আমীর মু'আভিয়াকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করেছিলেন। এটা হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফতকালে হয়েছিলো। তিনি তাঁকে ওই পদে বহাল রাখলেন। এরপর থেকে হযরত ওসমানের খিলাফতের শেষ যুগ পর্যন্ত প্রায় বিশ বছর যাবৎ তিনি ওই পদে বহাল ছিলেন। হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতামলে তিনি দাবী তুলেছিলেন যেন প্রথমে হযরত ওসমানের শাহাদতের সাথে জড়িত দোষীদের বিচার করা হয়। তারপর খিলাফতের অন্যান্য বিষয়ের সমাধা করা হোক। শেষ পর্যন্ত তাঁর এ দাবী তাঁর বিদ্রোহের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিলো। তা সিফ্‌সফীনের যুদ্ধের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিলো। এ যুদ্ধের পর হযরত মু'আভিয়া সিরিয়ার স্বাধীন হাকিম (শাসক) হয়ে গেলেন। ইসলামী রাষ্ট্রের বাকী পূর্ণ অংশের খলীফা রইলেন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদতের পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হিসেবে হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ছয়মাস খিলাফত পরিচালনা করেন। এরপর তিনি হযরত আমীর মু'আভিয়ার পক্ষে খিলাফত ত্যাগ করলেন। ফলে আমীর মু'আভিয়া গোটা ইসলামী রাজ্যের আমীর বা শাসক হলেন। মোটকথা, তিনি হযরত ওমর ফারূক্ব ও হযরত ওসমানের যুগে ২০ বছর যাবৎ প্রাদেশিক গভর্ণর (হাকিম) ছিলেন। পরবর্তীতে সিরিয়ার স্বাধীন আমীর ও গোটা ইসলামী রাজ্যের শাসক হিসেবে আরো বিশ বছর, সর্বমোট চল্লিশ বছর যাবৎ শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

হযরত আমীর মু'আভিয়ার ওফাত

হযরত আমীর মু'আভিয়া ৬০ হিজরীর ১০ রজব দামেস্কে অর্দ্ধাঙ্গ রোগে আক্রান্ত হয়ে ইনতিক্বাল করেন। বিশুদ্ধ বর্ণনানুসারে তাঁর বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। কেউ কেউ ৮৮ বছরও বর্ণনা করেছেন। যারা চল্লিশ বছর তাঁর বয়স লিখেছেন,

তা 'কাতেব' বা লিখকের ভুল ছিলো; অথবা শাসক হিসেবে তাঁর জীবনের সময় নির্ণয় করা হয়েছে।

বলাবাহুল্য, হযরত আমীর মু'আভিয়া তাঁর শাসনামলের শেষ ভাগে কয়েকটি বিষয় নিয়ে অস্বস্থি ভোগ করতেন। যেমন- হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে মনমালিন্য ও মতবিরোধ এবং উত্তরাধিকার নিয়োগের বিষয় ইত্যাদি। এজন্য তিনি তাঁর মৃত্যু শয্যায় বারংবার বলতেন, "আহা! আমি যদি ক্বোরাঈশ বংশের নগণ্য ব্যক্তি হতাম, জিত্ওয়া নামক অজ পাড়া গাঁয়ে থাকতাম এবং এসব ঝগড়া-বিবাদে পতিত না হতাম!" তিনি ওফাতের সময় ওসীয়ৎ করেছিলেন, "আমার নিকট নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর নখ মুবারক রক্ষিত আছে। তা গোসলের পর কাফনের ভিতর আমার চক্ষুযুগলের উপর যেন রাখা হয়। আমার নিকট হুযূর-ই আক্রামের কিছু চুল মুবারক, তহবন্দ শরীফ, চাদর ও কামীজ মুবারক রয়েছে। কামীজটা যেন কাফন হিসেবে পরানো হয়, চাদরটা যেন জড়িয়ে দেওয়া হয় এবং তহবন্দ শরীফ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় আর নাক ও কান ইত্যাদির উপর চুল মুবারকগুলো রেখে দেওয়া হয়। এর পরই যেন আমাকে পরম দয়ালু করুণাময়ের কাছে সোপর্দ করা হয়।" সুবহা-নাল্লাহ! এ কেমন খোদাভীরুতা ও নবী করীমের প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা!

হযরত আমীর মু'আভিয়ার যোগ্যতা ও দক্ষতা

হযরত আমীর মু'আভিয়া একান্ত সুবিচারক, দানশীল, ন্যায়পরায়ণ, রাজনীতিবিদ ও যোগ্য শাসক ছিলেন। তিনি গভর্ণর থাকাবস্থায় তাঁর এসব যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছিলো। খলীফা (গোটা মুসলিম রাজ্যের আমীর বা বাদশাহ্) হবার পরও এসব গুণ এবং বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন ছিলো।

হযরত ওমর ফারূক্ব ও হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার খিলাফতকালে হযরত আমীর মু'আভিয়া সিরিয়ার গভর্ণর ছিলেন। এ পদে তিনি দীর্ঘদিন অত্যন্ত দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তাঁর আওতাধীন এলাকায় অতি সহজে খাজনা আদায় করা হতো এবং তা মদীনা মুনাওয়ারায় পৌঁছিয়ে দেওয়া হতো। হযরত ওমর ফারূক্ব ও হযরত ওসমান তাঁর প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। হযরত ওমর ফারূক্ব তো অত্যন্ত হুশিয়ার ও প্রাদেশিক গভর্ণরদের প্রতি খুব কঠোর ছিলেন। সামান্য ভুল-ক্রুটি কিংবা রাষ্ট্র ও

ধর্মের কল্যাণের খাতিরে শাসক ও সিপাহ্সালারদের বরখাস্ত করতেন। বিশেষ কারণে তিনি হযরত খালিদ ইবনে ওয়ালীদের মতো সেনাপতিকেও বরখাস্ত করেছিলেন; কিন্তু হযরত আমীর মু'আভিয়াকে বহাল রেখেছিলেন। এতে বুঝা যায় যে, তাঁর দীর্ঘ শাসনামল ক্রুটিমুক্ত ছিলো।

হযরত আমীর মু'আভিয়ার ফযীলত

প্রথমত, হযরত আমীর মু'আভিয়া একজন অতি মর্যাদাবান সাহাবী ছিলেন। পবিত্র ক্বোরআন মজীদে সাহাবীদের সম্পর্কে যে প্রশংসা ও সুসংবাদগুলো দেওয়া হয়েছে, সেগুলো হযরত মু'আভিয়ার বেলায়ও প্রযোজ্য।

যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা সাহাবা-ই কেরামের সাথে জান্নাতের ওয়াদা করেছেন- وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنٰى (এবং আল্লাহ্ তাদের সকলের সাথে কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। ৪: ৯৫) এখানে 'কল্যাণ' মানে জান্নাত। এ সুসংবাদ সম্মানিত সাহাবীদের জন্য প্রযোজ্য। [সূত্র. তাফসীর-ই নূরুল ইরফান, এ আয়াত]

আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- اُولٰئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (তারা সবাই সত্যবাদী। ৫৯:৮) পবিত্র ক্বোরআনে আরো এরশাদ হয়েছে- رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ (আল্লাহ্ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। ৯৮:৮) আরো এরশাদ হয়েছে- وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ (আর কুফর, নির্দেশ অমান্য করা ও অবাধ্যতাকে তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দিয়েছেন। ৪৯: ৭) এ আয়াতও সাহাবা-ই কেরামের শানে প্রযোজ্য।

দ্বিতীয়ত: হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ঘনিষ্ট আত্মীয়-বংশের দিক দিয়েও, হুযূর-ই আক্রামের শ্বশুর বাড়ীর দিক দিয়েও। সুতরাং যেসব আয়াত হুযূর-ই আক্রামের নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে ওইগুলো হযরত আমীর মু'আভিয়ার বেলায়ও উত্তমরূপে প্রযোজ্য। হাদীস শরীফেও এ নিকটাত্মীয়তার বহু ফযীলত হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন। যেমন- "আমার সমস্ত সাহাবী উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। তোমরা তাদের মধ্যে যারই অনুসরণ করবে, হিদায়ত পাবে।" "আমার কোন সাহাবীর সোয়া একসের যব খায়রাত করা, তোমাদের পাহাড় সমতুল্য স্বর্ণ খায়রাত করার চেয়ে উত্তম।" "আমার সাহাবীদের প্রতি যে

বিদ্বেষ পোষণ করে, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, আর যে তাদের প্রতি ভালবাসা রাখে, সে আমাকে ভালবাসে।" [সূত্র. বোখারী, মুসলিম, তিরমিযী ইত্যাদি]

এসব হাদীস হযরত আমীর মু'আভিয়ার বেলায়ও প্রযোজ্য। এখানে লক্ষণীয় যে, নবী আলায়হিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম-এর সাথে সম্পর্ক ঈমানের সাথে হলে কার্যকর; অন্যথায় নয়। আবূ লাহাব ও আবূ জাহল প্রমুখ ঈমান না থাকার কারণে হুযূর-ই আক্রামের সাথে আত্মীয়তা থাকা সত্ত্বেও রক্ষা পায়নি। কিনান হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। কারণ সে মু'মিন ছিলোনা। পক্ষান্তরে, হযরত আমীর মু'আভিয়া ছিলেন একাধারে উচ্চ পর্যায়ের মু'মিন, আল্লাহর নবীর সাহাবী, অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ শাসক আর হুযূর-ই আক্রামের ঘনিষ্ট আত্মীয়। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

তৃতীয়ত: উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সাথে আমীর মু'আভিয়ার ছিলো বিশেষ ফযীলতও। যেমন-

এক. হযরত আমীর মু'আভিয়া ছিলেন ওহী লিখক ও হুযূর আক্রামের পত্র লিখক। হুযূর-ই আক্রাম যেসব ফরমান ও চিঠিপত্র ইত্যাদি রাজা-বাদশাহ্দের কাছে প্রেরণ করতেন, ওইগুলো হযরত আমীর মু'আভিয়া দ্বারা লিখাতেন। তাঁর হস্তাক্ষর খুব সুন্দর ছিলো এবং ভাষাশৈলী ও বিদ্যা-বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ। তিনি ছিলেন হুযূর-ই আক্রামের একান্ত বিশ্বাসভাজন।

বলাবাহুল্য, হুযূর-ই আক্রামের সর্বমোট তের জন কাতিব ছিলেন। তাঁরা হলেন চার খলীফা, আমির ইবনে ফুহায়রা, আবদুল্লাহ্ ইবনে আরক্বাম, উবাই ইবনে কা'ব, সাবিত ইবনে ক্বায়স ইবনে শাম্মাস, খালিদ ইবনে সা'ঈদ, ইবনুল 'আস, হাসানাহ্ ইবনে রবী', যায়দ ইবনে সাবিত, মু'আভিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান এবং শুরাহ্বীল ইবনে হাসানাহ্ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।)

তাঁদের মধ্যে হযরত মু'আভিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান এবং হযরত যায়দ ইবনে সাবিত এ কাজটা বেশি সমাধা করতেন।

[সূত্র. আবূ নু'আয়ম, ইমাম মাদায়েনী, ইমাম আহমদ ইবনে মুহাম্মদ, ইমাম ক্বাস্তলানী প্রমুখ]

চতুর্থত, হযরত আমীর মু'আভিয়া ছিলেন এক বড় জ্ঞানী ও মুজতাহিদ সাহাবী। ইমাম বোখারী হযরত আবূ মুলায়কাহ্ থেকে বর্ণনা করেন, সৈয়্যদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাকে যখন বলা হলো যে, হযরত আমীর মু'আভিয়া বিতরের নামায এক রাক্'আত পড়েন, তখন তিনি বললেন, "তিনি ফক্বীহ্ মুজতাহিদ। তাই, তা তাঁর জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত। তাঁকে কিছু

বলোনা।" হযরত ইবনে আব্বাস ছিলেন জ্ঞানসমুদ্র সাহাবী। হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খারেজীদের সাথে মুনাযারা (তর্ক যুদ্ধে)'র জন্য হযরত ইবনে আব্বাসকে পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি তাদেরকে পরাস্ত করেছিলেন। উল্লেখ্য, বিতর সম্পর্কে আমাদের ইমাম-ই আ'যমের দলীল হলো- অধিকাংশ সাহাবীদের অভিমত ও আমল। সহীহ্ বোখারী শরীফে অন্য এক রেওয়ায়তে বর্ণিত আছে যে, আমীর মু'আভিয়া বিতরের নামায এক রাক্'আত পড়ছিলেন, তখন তাঁর নিকট হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের এক গোলাম উপস্থিত ছিলেন। সে গিয়ে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের নিকট একথা বর্ণনা করলো। তিনি বললেন, "মু'আভিয়াকে কিছু বলোনা, তিনি অতি উচ্চ মর্যাদাশীল সাহাবী।" আমাদের ইমাম-ই আ'যম বলেন, "আম সাহাবীগণ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বিতরের নামায তিন রাক্'আতই পড়তেন। অন্যথায় হযরত ইবনে আব্বাসের গোলাম আশ্চর্যান্বিত হতো না এবং অভিযোগও করতোনা।"

পঞ্চমত: আমীর মু'আভিয়ার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে-

এক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল হযরত আবরাজ ইবনে সারিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম দো'আ করেছেন, 'হে আল্লাহ্! মু'আভিয়াকে কিতাব (ক্বোরআন) ও অংকের জ্ঞান দান করুন এবং তাকে আযাব থেকে রক্ষা করুন।"

দুই. তিরমিযী শরীফে হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ আমীরাহ্ মাদানী থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো দো'আ করেছেন, "হে আল্লাহ্, মু'আভিয়াকে হেদায়তপ্রাপ্ত ও হিদায়তদাতা করে দাও! এবং মু'আভিয়ার মাধ্যমে জনগণকে হিদায়ত দান করো।" ইমাম তিরমিযী এ হাদীসকে 'হাসান' পর্যায়ের বলেছেন।

তিন. হাফেয হারিস ইবনে উসামা এক দীর্ঘ হাদীস রেওয়ায়ত করেছেন, যার মধ্যে খোলাফা-ই রাশেদীন ও অন্যান্য সাহাবা-ই কেরামেরও ফযীলতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। ওই হাদীসে এটাও আছে-

وَمُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ اَعْلَمُ اُمَّتِىْ وَاَجْوَدُهَا

অর্থাৎ মু'আভিয়া আমার উম্মতের বড় জ্ঞানী, দয়ালু ও দানবীর।

চার. ইমাম ত্বাবারী স্বীয় সিয়র গ্রন্থে একটি দীর্ঘ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে খোলাফা-ই রাশেদীন ও 'আশারাহ্-ই মুবাশ্শারাহ্র ফযীলতসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীসের শেষ প্রান্তে এটাও আছে-

وَصَاحِبُ سِرِّىْ مُعَاوِيَةُ بْنُ اَبِىْ سُفْيَانَ -
فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَقَدْ نَجٰى وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَقَدْ هَلَكَ

অর্থ: ''আমার গোপনীয় বিষয়াদির সংরক্ষক হলো মু'আভিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান। যে ব্যক্তি তাদের সবাইকে ভালবাসবে সে নাজাত পাবে, আর যে তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে।''

চার. হাফেয ইমাম হায়তমী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার সূত্রে বর্ণনা করেছেন, একদা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বীয় পবিত্র স্ত্রী উম্মে হাবীবা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা)'র নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। দেখলেন তিনি আপন সহোদর আমীর মু'আভিয়ার মস্তক আপন কোলে নিয়ে বসে আছেন এবং তাঁকে বারংবার স্নেহভরে চুমু দিচ্ছেন। তখন হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, ''হে উম্মে হাবীবাহ্! তুমি কি মু'আভিয়াকে স্নেহ করছো?'' তিনি আরয করলেন, ''জী-হাঁ। সে আমার সহোদর (ভাই)।'' হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, ''আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলও মু'আভিয়াকে ভালবাসেন।''

পাঁচ. আবূ বকর ইবনে আবূ শায়বাহ্ স্বয়ং আমীর মু'আভিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, একদা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''হে মু'আভিয়া, যদি তুমি বাদশাহ হও, তবে কল্যাণ করো।'' তখন থেকে আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, আমার বাদশাহী মিলবে।

ছয়. আবূ ইয়া'লা হযরত আমীর মু'আভিয়া থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''হে মু'আভিয়া, যদি তুমি শাসক (বাদশাহ্) হও, তবে আল্লাহকে ভয় করো এবং ন্যায় বিচার করো।'' কিছুটা পার্থক্য সহকারে এ হাদীস 'মুসনাদে ইমাম আহমদ'-এও বর্ণিত হয়েছে।

সাত. ইমাম ত্বাবরানী 'আওসাত্ব' গ্রন্থে হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, হুযূর-ই আক্রাম আমার উদ্দেশে এরশাদ

করেছেন, ''হে মু'আভিয়া, যদি তুমি শাসক হও, তাহলে অপরাধীদেরকে যথাসম্ভব ক্ষমা করে দিও, নেক্কার লোকদের নেকী গ্রহণ করিও।''

এ রেওয়ায়ত ভিন্ন ভিন্নভাবে অনেক কিতাবে মওজুদ আছে।

ষষ্ঠত: সমস্ত আলিম, মুহাদ্দিস ও সাহাবা-ই কেরাম, আমীর মু'আভিয়ার প্রশংসা করেছেন। যেমন- ইমাম ক্বাস্তলানী শরহে বোখারীতে উল্লেখ করেছেন, ''আমীর মু'আভিয়া একান্ত প্রশংসার পাত্র এবং অনেক মহৎ গুণের ধারক।'' 'শরহে মুসলিম'-এ বর্ণিত যে, আমীর মু'আভিয়া ন্যায়পরায়ণ, জ্ঞানী ও বিশিষ্ট সাহাবীদের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম ইয়াফে'ঈ বলেছেন যে, আমীর মু'আভিয়া ভদ্র, দয়ালু, বুদ্ধিমান ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। আল্লাহ্ তা'আলা যেন তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য সৃষ্টি করেছেন। সমস্ত মুহাদ্দিস তাঁর নামের সাথে 'রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু' লিখেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা তাঁকে মুজতাহিদ ও ফক্বীহ্ সাহাবী বলেছেন। [সূত্র. সহীহ্ বোখারী]

ক্বাযী আয়ায রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি রেওয়ায়ত করেছেন, জনৈক ব্যক্তি হযরত মা'আনী ইবনে ইমরানকে জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয কি হযরত আমীর মু'আভিয়া থেকে উত্তম? তিনি রাগান্বিত হয়ে গেলেন এবং বললেন, ''হুযূর-ই আক্রামের সাহাবীর সাথে যেন কারো তুলনা করা না হয়। মু'আভিয়া হুযূর-ই আক্রামের সাহাবী, হুযূর-ই আক্রামের শ্যালক, ওহী লেখক এবং হুযূর-ই আন্ওয়ারের বিশ্বস্ত।''

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, 'আমীর মু'আভিয়া ও ওমর ইবনে আবদুল আযীযের মধ্যে কে উত্তম?' তদুত্তরে তিনি বললেন, হযরত মু'আভিয়ার ঘোড়ার নাকের ধূলি, যা হুযূর-ই আক্রামের সাথে জিহাদে লেগেছে, ওমর ইবনে আবদুল আযীযের চেয়ে হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ। এ মন্তব্যকারী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারকও ওই বুযুর্গ, যাঁর ইল্ম, ধার্মিকতা, তাক্বওয়া ও আমনতদারীর ব্যাপারে হুযূর-ই আক্রামের সমস্ত উম্মত একমত। তাঁর সাথে হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম দেখা করতেন।

খোদ্ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও অনেক সময় হযরত আমীর মু'আভিয়ার প্রশংসা করেছেন। যেমন, ইমাম ত্বাবরানী সহীহ্ সনদ সহকারে বর্ণনা করেছেন, জনৈক ব্যক্তি সিফ্ফীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে আমীর মু'আভিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তখন তিনি বললেন, قَتْلَانَا وَقَتْلٰى مُعَاوِيَةَ فِى الْجَنَّةِ (অর্থাৎ আমাদের ও মু'আভিয়ার পক্ষে

নিহত সবাই জান্নাতবাসী)। তিনি অন্যত্র বলেন, اِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا (আমাদের ভাই আমাদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে।)

হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু যখন সিরিয়ায় প্রবেশ করলেন, তখন আমীর মু‘আভিয়ার শান-শওকত ও দুর্ধর্ষ সৈন্যবাহিনী দেখতে পেলেন। তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন, "মু‘আভিয়া আরবের কিস্‌রা।"

প্রসিদ্ধ তাবে‘ঈ ইমাম আ'মাশ বলেছিলেন, "তোমরা যদি আমীর মু‘আভিয়াকে দেখতে, তবে বলতে, তিনি ইমাম মাহদী।"

সপ্তমত, সাইয়্যেদুনা ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু প্রায় সাত মাস খিলাফতের দায়িত্ব পালনের পর হযরত আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর অনুকূলে খিলাফত থেকে ইস্তফা দান করেন। আর হযরত আমীর মু‘আভিয়াও হযরত ইমাম হাসানের জন্য বাৎসরিক একটি ওযীফা (ভাতা) বা নযরানা নির্দ্ধারণ করেছিলেন। হযরত ইমামও তা গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মু‘আভিয়ার মধ্যে যদি শরীয়ত-বিরোধী কোন বিষয় থাকতো, তাহলে নবী-দৌহিত্র ও হায়দারে কার্‌রারের শাহযাদা হযরত হাসান কখনো তাঁর অনুকূলে খিলাফত ছাড়তেন না এবং ওই নযরানাও গ্রহণ করতেন না।

আর অদৃশ্য-জ্ঞানের ধারক নবী-ই আকরাম হযরত হাসানের এ পদক্ষেপের আগাম প্রশংসা করে এরশাদ করেছিলেন, "আমার এ দৌহিত্র হলেন সাইয়্যেদ। আল্লাহ্ তা‘আলা তার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি বড় দলের মধ্যে সমঝোতা করাবেন।"

আরো লক্ষ্যণীয় যে, এ সমঝোতার সময় হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু প্রাপ্ত বয়স্ক, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ছিলেন; কিন্তু তিনিও এ সন্ধির ব্যাপারে কোন দ্বিমত পোষণ করেননি; বরং তিনিও এ'তে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। যদি আমীর মু‘আভিয়া সম্পর্কে তাঁদের কোন বিষয়ে সন্দেহ কিংবা তাঁর ন্যায়পরায়ণতা ও তাক্বওয়া ইত্যাদির ব্যাপারে দ্বিমত থাকতো তাহলে তাঁরা সমঝোতার ব্যাপারে সম্মতিতো দূরের কথা; বরং মোকাবেলা করতেন, যেমনিভাবে ইয়াযীদের বিরোধিতা ও তার সাথে মোকাবেলা করেছেন।

অষ্টমত, হযরত আমীর মু‘আভিয়া থেকে সর্বমোট ১০৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে চারটি বোখারী ও মুসলিমে সন্নিবিষ্ট হয়েছে, চারটি শুধু বোখারীতে এবং পাঁচটি কেবল মুসলিমে আর অবশিষ্ট হাদীসগুলো আহমদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, বায়হাক্বী, হযরত আমীর মু‘আভিয়ার তাক্বওয়া ও ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদির প্রমাণ বহন করে। মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী রাহমাতুল্লাহি তা‘আলা আলায়হি

আমীর মু‘আভিয়াকে সমস্ত মু'মিনের মামা বলেছেন। মসনভী শরীফে তাঁর অনেক মহৎ কাজের বর্ণনা এসেছে।

নবমত, আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু হলেন ইসলামের প্রথম শানদার বাদশাহ্, যেমন হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু হলেন ইসলামের প্রথম খলীফা। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার পর ত্রিশ বছর পর্যন্ত খিলাফত-ই রাশেদাহ্ বলবৎ থাকবে, তারপর রাজতন্ত্র শুরু হবে। বাস্তবেও দেখা গেছে যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর শাহাদাতের সময় উল্লিখিত খিলাফতের সময় প্রায় সাত মাস বাকী ছিলো। এ বাকী সময় হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু পূর্ণ করে খিলাফত থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। কেননা, খিলাফতের সময় তখন পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। এরপর থেকে গোটা মুসলিম রাজ্যে প্রথম সুলতান হন হযরত আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু।

হযরত আমীর মু‘আভিয়ার বাদশাহীতে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম যে সন্তুষ্ট ছিলেন তা সহীহ্ বোখারী শরীফের নিম্নলিখিত হাদীস শরীফ থেকেও প্রমাণিত হয়-

সহীহ্ বোখারী শরীফে 'স্বপ্নের বিবরণ ও জিহাদের বর্ণনা' শীর্ষক অধ্যায়ে কয়েক জায়গায় হযরত আনাস প্রমুখ (রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুম) থেকে বর্ণিত-

হযরত ওবাদাহ্ ইবনে সামিতের স্ত্রী হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের ঘরে হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। হঠাৎ তিনি (হুযূর-ই আক্‌রাম) আনন্দিত হয়ে মুচকি হেসে জাগ্রত হলেন। হযরত উম্মে হারাম আরয করলেন, "ইয়া রাসূলাল্লাহ্, এ আনন্দ ও মুচকি হাসির কারণ কি?" হুযূর-ই আকরাম এরশাদ ফরমালেন, "এ মাত্র স্বপ্নে আমার সামনে আমার উম্মতের গাযী (যোদ্ধা)কে উপস্থাপন করা হয়েছে, যে এ সমুদ্র এমন শান-শওকতের সাথে অতিক্রম করেছে যেন সিংহাসনে বাদশা আরোহন করে জিহাদ করতে যাচ্ছে।" উম্মে হারাম আরয করলেন, "ইয়া রসূলাল্লাহ্, আমার জন্য দো'আ করুন! আল্লাহ্ তা‘আলা আমাকেও যেন তাঁর সাথে জিহাদে অংশ গ্রহণ করার তাওফীক্ব দান করেন।" হুযূর-ই আন্‌ওয়ার এরশাদ ফরমালেন, "তুমিও তাদের মধ্যে থাকবে।" এটা এরশাদ করে হুযূর আবার শুয়ে পড়লেন। পুনরায় তিনি অনুরূপ আনন্দিত হয়ে জাগ্রত হলেন এবং পুনরায় ওই স্বপ্নের কথা উল্লেখ করলেন। উম্মে হারাম পুনরায় আরয করলেন, "হুযূর, আমার জন্য

দো'আ করুন, আমিও যেন ওই জিহাদে ওই সব গাযীর সাথে থাকতে পারি।'' হুযূর এরশাদ ফরমালেন, ''না, তুমি প্রথমোক্ত গাযীদের সাথে থাকবে।'' হযরত আনাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, এ জিহাদ হযরত আমীর মু'আভিয়ার রাজত্বকলে হয়েছিলো। উম্মে হারাম বিনতে মিলহান হযরত আমীর মু'আভিয়ার সাথে সমুদ্র অতিক্রম করছিলেন এবং সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পর স্বীয় উষ্ট্র থেকে পড়ে গিয়ে শাহাদৎ বরণ করেন। হাদীস শরীফটার শেষ বচনগুলো নিম্নরূপ-

فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِىْ زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحرِ فَهَلَكَتْ

অর্থাৎ অতঃপর (উম্মে হারাম বিনতে মিলহান) হযরত মু'আভিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ানের যুগে সমুদ্রে আরোহণ করলেন। অতঃপর যখন সমুদ্র পার হলেন তখন তিনি তাঁর উট থেকে পড়ে গেলেন এবং ইন্তিক্বাল করলেন। [বোখারী শরীফ]

এ হাদীস শরীফে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আন্হু ইসলামের বাদশাহ হবেন। তিনি গাযী হবেন। ওই জিহাদে অংশ গ্রহণকারীগণ উচ্চ মর্যাদাশীল হবেন। তাঁর শানমান দেখে হুযূর-ই আক্রাম খুশী হয়েছেন। সর্বোপরি, উক্ত হাদীস শরীফ থেকে বুঝা যায় যে, হযরত উম্মে হারাম বিনতে মিলহানের অনুকূলে হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দো'আ কুবূল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর-ই আক্রামকে আগে ও পরের সব বিষয়ের জ্ঞান দিয়েছেন।

দশমত, আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু একান্ত উদারমনা, দানশীল, প্রজ্ঞাবান ও দয়ালু ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর সম্পর্কে বহু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। নিম্নে কয়েকটা বর্ণনা ও ঘটনা উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

এক. একদা হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সাইয়্যেদুনা হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর জন্য চার লক্ষ দিরহাম নযরানা পেশ করেছিলেন। হযরত ইমাম হাসান তা গ্রহণ করেছিলেন।

[সূত্র. কিতাবুন্নাহিয়াহ ও মিরক্বাত]

দুই. হাকিম হিশাম ইবনে মুহাম্মদের বরাতে বর্ণিত, হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ইমাম হাসানের জন্য বার্ষিক ওযীফা (ভাতা) স্বরূপ একলক্ষ দিরহাম নির্দ্ধারণ করেছিলেন। ঘটনাচক্রে এক বছর এ ওযীফা হযরত হাসানের নিকট পৌঁছায়নি। তিনি হযরত আমীর মু'আভিয়াকে তা স্মরণ

করিয়ে দেওয়ার জন্য চিঠি লিখতে মনস্থ করেছিলেন; কিন্তু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম স্বপ্নে ইমাম হাসানের উদ্দেশ্যে এরশাদ করলেন, ''তুমি কোন মাখলূক্বের কাছে লিখোনা, আল্লাহর মহান দরবারে আরয করো এবং নিম্নলিখিত দো'আটা পাঠ করো-

اَللّٰهُمَّ اقْذِفْ فِىْ قَلْبِىْ رَجَاءَكَ وَاقْطَعْ رَجَائِىْ عَمَّنْ سِوَاكَ حَتّٰى لَا اَرْجُوْ اَحَدًا غَيْرَكَ اَللّٰهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِىْ وَقَصُرَ عَنْهُ عَمَلِىْ وَلَمْ تَنْتَهِ اِلَيْهِ رَغْبَتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْأَلَتِىْ وَلَمْ يَجْرِ عَلٰى لِسَانِىْ مِمَّا اَعْطَيْتَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ مِنَ الْيَقِيْنِ فَخُصَّنِىْ بِهٖ يَارَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

এ আমলটি আরম্ব করার এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়নি, আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পনের লক্ষ দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন। অর্থাৎ দু' লাখ ওযীফা (ভাতা) এবং ১৩ লক্ষ দিরহাম নযরানা হিসেবে। [সূত্র. আন্ নাহিয়াহ ইত্যাদি]

উল্লেখ্য, উক্ত দো'আ চাহিদা পূরণের জন্য উৎকৃষ্ট ও একটি পরীক্ষিত দো'আ। সুতরাং এ দো'আ সবাই পড়তে পারেন।

তিন. একবার হযরত আমীর মু'আভিয়া দরবারে উপস্থিত সবাইকে বললেন, ''তোমাদের মধ্যে যে কেউ হযরত আলীর শানে ক্বাসীদা (কবিতা) পাঠ করবে, আমি তার প্রতিটি পংক্তি (চরণ)-এর জন্য এক হাজার দিনার দেবো।'' উল্লেখ্য, উপস্থিত কবিগণ ক্বাসীদা পাঠ করেছেন এবং প্রত্যেকে ওই প্রতিশ্রুত পুরস্কারও লাভ করেছিলেন। এখানে বিশেষ লক্ষণীয় যে, প্রত্যেক কবি তাঁর কবিতায় হযরত আলীর যে প্রশংসাই করেছেন, প্রত্যেকটি প্রশংসা-বাক্যের পর হযরত আমীর মু'আভিয়া বলছিলেন, ''তিনি এর চেয়েও উত্তম।'' বিশিষ্ট কবি (শা'ইর) হযরত আমর ইবনুল আস হযরত আলী কার্‌রামাল্লাহু ওয়াজহাহুর শানে তাঁর পঠিত কবিতার এক পর্যায়ে নিম্নলিখিত চরণও পড়েছিলেন-

هُوَ النَّبَأُ الْعَظِيْمُ وَفُلْكُ نُوْحٍ ـ وَبَابُ اللهِ وَانْقَطَعَ الْخِطَابُ

অর্থ: তিনি (হযরত আলী) হলেন একাধারে বড় সুসংবাদ, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর জাহাজ ও আল্লাহর দরজা। তাঁকে বাদ দিয়ে কথা বলা যায় না।

এ চরণটির জন্য হযরত আমীর মু'আভিয়া কবিকে সাত হাজার দিনার বখশিশ করেছিলেন। [নাফাইসুল যুনূন]

চার. ইবনে আসাকির বর্ণনা করেছেন, যুদ্ধকালীন সময়ে হযরত আক্বীল (হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ভাই) হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন, ''আমার কিছু টাকার দরকার।'' তিনি বললেন, ''এখনতো

আমার নিকট টাকা নেই।” তিনি আরয করবেন, “তাহলে আমাকে আমীর মু‘আভিয়ার নিকট যাবার অনুমতি দিন।” তিনি অনুমতি দিলেন। হযরত আক্বীল হযরত আমীর মু‘আভিয়ার নিকট গেলেন। আমীর মু‘আভিয়া তাঁর খুব সমাদর করলেন এবং এক লক্ষ টাকা নযরানা স্বরূপ পেশ করলেন। [সাওয়া-ইক্বে মুহরিক্বাহ্]

এভাবে আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর বদান্যতার বহু ঘটনা বর্ণিত আছে।

একাদশত, আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর মধ্যে ছিলো অসাধারণ খোদাভীতি, নবীপ্রেম এবং আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, আমীর মু‘আভিয়া তাঁর ওফাতের সময় বারংবার বলছিলেন, “আহা! আমি যদি কোন অজ পাড়াগাঁয়ে নির্জন যিন্দেগী যাপন করতাম, তাহলে এতসব ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ে পড়তামনা।” দ্বিতীয়ত, তিনি ওসীয়ৎ করছিলেন যেন তাঁর কাফনে হুযূর-ই আক্রামের নখ মুবারক, চুল মুবারক, জামা মুবারক ও তহবন্দ শরীফ, যেগুলো তাঁর নিকট সংরক্ষিত ছিলো, রেখে দেওয়া হয়। এগুলো তাঁর খোদাভীতি ও নবী করীমের প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালবাসার প্রমাণ। তাছাড়া, তিনি হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুকে অত্যন্ত সম্মান ও ক্বদর করতেন। নিম্নে আহ্লে বায়তের প্রতি হযরত আমীর মু‘আভিয়ার ভক্তি ও ভালবাসার কতিপয় উদাহরণ পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

এক. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল তাঁর ‘মুসনাদ’-এ আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন, ‘‘নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর মুখে ও ঠোঁটে চুমু দিতেন।” আমীর মু‘আভিয়া আরো বলেন, “এমন মুখ ও ঠোঁটকে, যাতে হুযূর মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম চুমু দিয়েছেন, আগুন স্পর্শ করতে পারে না। [কিতাবুন্ না-হিয়াহ্]

দুই. ওই ‘মুস্নাদ-ই ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল’-এ আরো বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি হযরত আমীর মু‘আভিয়াকে একটি মাসআলা জিজ্ঞাসা করেছিলো। তিনি বলেন, “এ মাস্আলা তুমি আলী মুরতাদ্বাকে জিজ্ঞাসা করো। তিনি আমার চেয়ে বড় জ্ঞানী।” লোকটি বললো, “আপনি বলুন। আমার নিকট আপনার জবাব অধিকতর পছন্দনীয়।” আমীর মু‘আভিয়া বললেন, “তুমি এটা খুব অন্যায় কথা বলেছো। তুমি কি তাঁকে ঘৃণা করো, যাকে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা‘আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিপূর্ণ জ্ঞানের জন্য সম্মান দিয়েছেন? নবী করীম

এরশাদ করেছেন, ‘হে আলী! তুমি আমার জন্য তেমনি, যেমন হযরত মূসার জন্য হযরত হারূন; কিন্তু আমার পরে কোন নবী নেই।” হযরত আলীর জ্ঞানের এমন ক্বদর যে, হযরত ওমর ফারূক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু কোন সমস্যার সম্মুখীন হলে তাঁর (হযরত আলী) সাহায্য নিতেন।”

এতটুকু বলার পর হযরত আমীর মু‘আভিয়া ওই লোককে বললেন, “তুমি আমার সামনে থেকে উঠে যাও।” এমনকি তার তিনি নাম ভাতা-গ্রহীতাদের দপ্তর থেকে বাদ দিয়ে দিলেন। [কিতাবুন্না-হিয়াহ্]

তিন. ইমাম মুহাম্মদ ইবনে মাহমূদ আমলী ‘নাফা-ইসে ফুনূন’ নামক কিতাবে বর্ণনা করেছেন, একদা হযরত আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর দরবারে সাইয়্যেদুনা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর কথা আলোচনায় আসলো। তখন আমীর মু‘আভিয়া বললেন, “আলী বাঘ ছিলেন, আলী পূর্ণিমার চাঁদ দিলেন, আলী আল্লাহ্র রহমতের বারিধারা ছিলেন।” উপস্থিত লোকদের থেকে একজন বললো, “আপনি উত্তম, না আলী?” তিনি বললেন, “আলীর কদমও আবূ সুফিয়ানের বংশ থেকে উত্তম।” তখন তাঁকে পুনরায় বলা হলো, “আপনি হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন কেন?” তিনি বললেন, “সেটা রাষ্ট্রীয় যুদ্ধ ছিলো।” [সূত্র. কিতাবুন্ না-হিয়াহ]

চার. হযরত আমীর মু‘আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু একদা যারার ইবনে হামযাকে হযরত আলী ইবনে আবূ তালিব (রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহু)’র গুণাবলী আলোচনা করে শুনানোর জন্য বললেন। তিনি প্রথমে নিজের অপরাগতার কথা জানালেন। তখন হযরত আমীর মু‘আভিয়া বললেন, “তোমাকে আল্লাহর শপথ! নিশ্চয় শুনাও!” তখন যারার ইবনে হামযা অতি প্রাঞ্জল ভাষায় হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা‘আলা আনহুর গুণাবলী শুনালেন। তাঁর ওই বর্ণনার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

“সাইয়্যেদুনা আলী মুর্তাদ্বা বড় দানশীল ছিলেন। তিনি প্রচন্ড শক্তিশালী ছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তমূলক (চূড়ান্ত সঠিক কথাই) বলতেন। ন্যায়বিচার করতেন। তাঁর চর্তুপার্শ্ব থেকে জ্ঞানের নদী প্রবাহিত হতো। তাঁর মুখ থেকে জ্ঞানই বের হতো। দুনিয়ার চাকচিক্য থেকে তিনি আলাদা থাকতেন। রাতের নিরবতায় তিনি আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। সারারাত আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করতেন। প্রায়শ: আখিরাতের চিন্তায় বিভোর থাকতেন। মোটা কাপড় ও মা’মূলী খাবার পছন্দ করতেন। সাধারণ লোকদের মতো চলাফেরা করতেন।

যখনই তাঁকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হতো, তাৎক্ষণিকভাবে তার জবাব দিতেন। আমরা তাঁকে আহ্বান করতেই তিনি এসে যেতেন। তিনি এত সাদাসিধে হওয়া সত্ত্বেও তাঁর খোদাপ্রদত্ত অসাধারণ ব্যক্তিত্বের সামনে কথা বলতে আমাদের সাহস হতোনা। তিনি দ্বীনদারদের সম্মান করতেন, গরীব-মিসকীনদেরকে নিজের কাছে রাখতেন। তাঁর দরবারে দুর্বল লোকেরা নিরাশ-হতাশ হতোনা এবং প্রভাবশালীগণ বে-পরোয়া ছিলোনা। আল্লাহরই শপথ, আমি হযরত আলীকে অনেক সময় এমনই দেখতাম যে, রাতের নক্ষত্র ডুবে যেতো, আর হযরত আলী তেমনভাবে ক্রন্দন করতেন, যেমন কাউকে বিষাক্ত বিচ্ছু কামড় দিলে ক্রন্দন করে। কেঁদে কেঁদে তিনি বলতেন, "আফসোস, আফসোস! আয়ুষ্কাল সংক্ষিপ্ত, কিন্তু সফর দীর্ঘ। আসবাবপত্র (পাথেয়) কম, কিন্তু রাস্তা বিপদসঙ্কুল।" তাঁর দাড়ি শরীফ থেকে অশ্রু টপকে পড়তো। আর তিনি বলতেন, "আফসসোস! আফসোস!"

হযরত আমীর মু'আভিয়াও এ বক্তব্য শুনে অঝোর নয়নে কাঁদছিলেন আর বলছিলেন, "আল্লাহরই শপথ! আবুল হাসান (আলী) তেমনি ছিলেন; তিনি তেমনি ছিলেন, তিনি তেমনি ছিলেন।" [সূত্র. সাওয়া-ইক্বে মুহরিক্বাহ্]

পাঁচ. এক কবি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রশংসা এভাবে করলেন-

هُوَ الْبَكَّاءُ فِى الْمِحْرَابِ لَيْلاً ـ هُوَ الضَّحَّاكُ فِى يَوْمِ الضِّرَابِ

অর্থ: তিনি মসজিদের মিহরাবে ক্রন্দনকারী। তিনি যুদ্ধের ময়দানে হাস্যকারী।

জিহাদের ময়দানে যখন তিনি নামতেন, তখন বলতেন-

اَنَا الَّذِىْ سَمَّتْنِىْ اُمِّىْ حَيْدَرَ

অর্থ: আমি হলাম ওই বাহাদুর (বীরপুরুষ) যে, আমার আম্মা আমার নাম 'হায়দার' (বারংবার ফিরে এসে হামলাকারী বাঘ) রেখেছেন।

তাহাজ্জুদের সময় তিনি যখন মসজিদের মেহরাবে আসতেন, তখন আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে এ বলে আরয করতেন-

اِلٰهِىْ عَبْدُكَ الْعَاصِىْ اَتَاكَ ـ مُقِرًّا بِالذُّنُوْبِ وَقَدْ دَعَاكَ

অর্থ: হে আল্লাহ্! তোমার গুনাহ্গার বান্দা তোমার দরবারে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে তার পাপরাশির কথা স্বীকার করছে। আর তোমার দরবারে দো'আ প্রার্থনা করছে।

মোটকথা, তিনি মাখলূক্বের সামনে হাস্যকারী আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে ক্রন্দনকারী।

আমীর মু'আভিয়ার কারামত

হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বহু কারামত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে কয়েকটা কারামত উল্লেখ করা হলো-

এক. যখন হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদতের খবর পৌঁছলো, তখন তিনি বললেন, "মক্কাবাসীগণ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে মক্কা শরীফ থেকে আলাদা করেছিলো। সুতরাং মক্কা শরীফ আর কখনো 'দারুল খিলাফত' (রাজধানী) হয়নি, হবেও না। এখন মদীনাবাসীরা মুসলমানদের খলীফা হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে শহীদ করলো। ওখান থেকেও খিলাফত বের হয়ে গেলো। আর কখনো ওখানে খিলাফত (রাজনৈতিক রাজধানী) হবে না।"

বাস্তবেও তাই হলো। হেরমাঈন শরীফাঈন এরপর থেকে আজ পর্যন্ত স্থায়ী 'দারুল খিলাফত' (রাজধানী) হয়নি। মক্কা শরীফে (ইয়াযীদের পর) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে যোবায়র রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফত ঘোষণা করলেও তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। আর মদীনা শরীফে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওসমানের পর খলীফা মনোনীত হলেও তিনি তাঁর রাজধানী করেছিলেন কূফায়।

দুই. হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন ইয়াযীদকে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত মনোনীত করলেন, তখন তিনি দো'আ করলেন, "হে আল্লাহ্, হে আমার মুনিব, যদি ইয়াযীদ উপযুক্ত না হয়, তবে তার রাজত্বকে পরিপূর্ণ করোনা।" বাস্তবেও তাই হলো। হযরত আমীর মু'আভিয়ার পর কুখ্যাত ইয়াযীদ মাত্র দু'বছর কয়েক মাস জীবিত ছিলো। তার রাজত্ব তো পূর্ণাঙ্গতা পায়নি, রাজত্ব তার বংশ থেকে মারওয়ানের বংশে স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিলো।

তিন. এ ঘটনা অতি প্রসিদ্ধ যে, একবার হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু স্বীয় মহলে নিদ্রারত ছিলেন। হঠাৎ এক ব্যক্তি এসে তাঁকে তাহাজ্জুদের নামাযের জন্য জাগালো। তিনি বললেন, "কে তুমি? মহলে কিভাবে প্রবেশ করলে? সে বললো, "আমি ইবলীস।" তিনি বললেন, "তোমার কাজতো নামাযের জন্য জাগানো নয়, ঘুম পাড়িয়ে নামায ক্বাযা করানো।" সে বললো, "আমি ইতোপূর্বে একরাতে আপনার নামায ক্বাযা করিয়েছিলাম; কিন্তু পরদিন আপনি তজ্জন্য এতো বেশি কান্নাকাটি করেছিলেন যে, আমি ফেরেশতাদেরকে বলাবলি করতে শুনেছি, 'আমীর মু'আভিয়ার এ অনুশোচনা ও কান্নাকাটির ফলে

তাঁকে পাঁচশ' নামাযের সাওয়াব দেওয়া হয়েছে।' তাই, আমি ভাবলাম যে, আজও যদি আপনার নামায কাযা করাই, তাহলে আপনি আবার কান্নাকাটি করবেন এবং হাজার নামাযের সাওয়াব পেয়ে পাবেন। আমি চাইনা আপনি বেশি নামাযের সাওয়াব পান। তাই, আপনাকে আগেভাগে নামাযের জন্য জাগিয়ে দিলাম।'' [মসনভী শরীফ: দ্বিতীয় খন্ড: পৃ. ২৩]

মাওলানা রূম আলায়হির রাহমাহ্ ঘটনাটার বর্ণনার শুরুতে লিখেছেন, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, ''মু'মিনদের অবস্থা একান্ত গোপন প্রাসাদের মতো, যা ভিতর থেকে তালাবদ্ধ থাকে, বাইরে থেকে উঁকি মেরে দেখার কোন উপায় নেই। যদি কেউ ঘটনাক্রমে তাতে প্রবেশ করতে পারে, তবে তার নিকট সব উদ্ঘাটিত হয়ে যায়।''

এ ঘটনা থেকে একাধারে আমীর মু'আভিয়ার কারামত, তাঁর তাক্বওয়া-পরহেযগারী, আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা, ইবলীসের উপর ক্ষমতা প্রয়োগ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। বস্তুত: যাঁর হাত হুযূর-ই আক্রামের হাতে রয়েছে, তা থেকে শয়তানও ছুটে পালাতে পারেনা, আর যে চোখে হুযূর মোস্তফার নূরানী চেহারা ঈমান ও মুহাব্বত সহকারে দেখেছে, তা থেকে কোন রহস্য গোপন থাকতে পারে না। হুযূর-ই আক্রামের শীর্ষস্থানীয় সাহাবী হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও একবার ইবলীস শয়তানকে ধরে ফেলেছিলেন। সে তখন তাঁর হাত থেকে নিজেকে ছাড়াতে না পেরে 'আয়াতুল কুরসী'র ফযীলত বর্ণনা করে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে পালাতে হয়েছিলো।

।।দুই।।

আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিপক্ষে কৃত আপত্তিসমূহ ও সেগুলোর খন্ডন

হযরত আমীর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে আজ পর্যন্ত যেসব অভিযোগ আমাদের নিকট পৌঁছেছে, সেগুলো উদ্ধৃত করে, ওইগুলোর দাঁতভাঙ্গা জবাবও পেশ করার প্রয়াস পাচ্ছি। এতে মুসলিম সমাজ একজন সম্মানিত সাহাবী-ই রসূল সম্পর্কে তাঁদের আক্বীদা বা বিশ্বাসকে আরো মজবুত করতে পারবেন, অন্যদিকে এ প্রসঙ্গে বাতিল মতবাদীদের অশালীন সমালোচনার পথ রুদ্ধ হবার

দৃঢ় আশা করা যায়। তাদের নসীবে যদি হিদায়ত থাকে, তবে তারাও তাওবা করে সঠিক পথে এসে যাবার সুযোগ পাবে।

আপত্তি নং ১.

আমীর মু'আভিয়া নাকি হাজার হাজার মুসলমানের রক্তপাত ঘটিয়েছেন। তিনি যদি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করতেন, তাহলে মুসলমানদের এ রক্তপাত হতোনা। তদুপরি, মু'মিন-মুসলমানের হত্যাকারীর বিরুদ্ধে কঠিন শাস্তির ঘোষণা এসেছে-

وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَائُه جَهَنَّمُ ط خَالِدًا فِيْهَا وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَه
وَاَعَدَّلَه عَذَابًا عَظِيْمًا [سوره نساء]

তরজমা: এবং যে ব্যক্তি কোন মু'মিনকে জেনে বুঝে হত্যা করে, তার শাস্তি হচ্ছে- জাহান্নাম। তাতে সে স্থায়ীভাবে থাকবে, আল্লাহ্ তার উপর রুষ্ট হয়েছেন এবং তাকে অভিসম্পাত করেছেন। আর তার জন্য তৈরী রেখেছেন মহা শাস্তি। [সূরা নিসা: আয়াত-৯৩, কান্যুল ঈমান]

সুতরাং এ আয়াত শরীফ হযরত আমীর মু'আভিয়ার জন্যও প্রযোজ্য।

খন্ডন

এর দু'টি জবাব দেওয়া যায়- একটি ইলযামী বা তাদের কথায় তাদের জবাব। আর অপরটি তাহক্বীক্বী বা বিশ্লেষণধর্মী। ইলযামী জবাব হচ্ছে- যদি তা-ই হয়, তাহলে হযরত আয়েশা, হযরত ত্বালহা ও হযরত যুবায়র (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)কে একই অভিযোগে অভিযুক্ত করতে হবে। কেননা, তাঁরা সবাই হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরোধিতা করেছিলেন। এর ফলে 'জঙ্গে জামাল' বা 'উষ্ট্রির যুদ্ধ' সংঘটিত হয়েছিলো এবং তাতে অনেক মুসলমান শহীদ হয়েছেন; অথচ হযরত আয়েশার জান্নাতী হওয়া তেমনি নিশ্চিত, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এক হওয়া নিশ্চিত। কেননা, তিনি যে জান্নাতী, তা পবিত্র ক্বোরআনে সুস্পষ্টভাবে এরশাদ হয়েছে। আর হযরত ত্বালহা এবং যুবায়রও নিঃসন্দেহে জান্নাতী। তাঁরা 'আশরাহ্-ই মুবাশ্‌শারাহ্' (জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত দশজন)-এর অন্তর্ভুক্ত।

দ্বিতীয়ত, গবেষণাধর্মী জবাব হচ্ছে- মু'মিনের হত্যার তিনটি ধরণ আছে-

১. তাকে এ জন্য হত্যা করা যে, সে মুসলমান/মু'মিন হয়ে গেছে। সেটা কুফরী; এমন হত্যায় ইসলাম ও ঈমানের প্রতি হত্যাকারীর ঘৃণাবোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। উপরোক্ত আয়াতে এ ধরনের হত্যাকারীর কথা বুঝানো হয়েছে। কেননা, জাহান্নামে স্থায়ী হওয়া একমাত্র কাফিরদের জন্যই।

২. কোন মুসলমানকে পার্থিব শত্রুতা বা ব্যক্তিগত দুশ্‌মনির কারণে হত্যা করা; যেমনটি আজকাল অহরহ ঘটছে। এটা জঘন্য অপরাধ ও কবীরাহ্ গুনাহ্ এবং

৩. ভুল বুঝাবুঝির কারণে মুসলমানদের মধ্যে যুদ্ধ হয়ে যাওয়া আর তাতে মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন হওয়া। এটা ভুল বুঝাবুঝি মাত্র, পাপও নয়; কুফরী তো নয়ই। এ তৃতীয় ধরনের হত্যাকান্ডের বর্ণনা এসেছে নিম্নলিখিত আয়াতে-

وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا

তরজমা: এবং যদি মুসলমানদের দু'টি দল পরস্পর যুদ্ধ করে, তবে তাদের মধ্যে সন্ধি করাও। [সূরা হুজুরাত: আয়াত-৯, কান্‌যুল ঈমান]

লক্ষ্য করুন, এ আয়াত শরীফে হত্যাকারী ও যুদ্ধকারী উভয় দলকে মু'মিন বলা হয়েছে। আর তাদের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দেওয়ার নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। হযরত আলী মুর্তাদ্বা এবং হযরত আমীর মু'আভিয়ার যুদ্ধও এ তৃতীয় পর্যায়ের যুদ্ধের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং তাঁদের বিরুদ্ধে ওই আপত্তিটি অমূলক।

আপত্তি নং-২.

আমীর মু'আভিয়ার মনে আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ ছিলো। তিনি আহলে বায়তের প্রতি নির্যাতন চালাতেন; অথচ খোদ্ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "যে হযরত আলীকে কষ্ট দিয়েছে, সে আমাকে কষ্ট দিয়েছে।" তাছাড়া, আমীর মু'আভিয়া আহলে বায়তের সাথে যুদ্ধ করেছেন; অথচ হুযুর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন, "যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে, সে আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। সে মু'মিন নয়।"

খন্ডন.

এ আপত্তিরও দু'ভাবে জবাব দেওয়া যায়- ১. ইলযামী ও ২. তাহক্বীক্বী (যথাক্রমে পাল্টা জবাব ও বিশ্লেষণধর্মী জবাব)।

এলযামী জবাব হচ্ছে- আল্লাহরই পানাহ্, এ আপত্তিতে তো তারা স্বয়ং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকেও অভিযুক্ত করে বসেছে। কারণ, হয়তো তারা একথাও বলেছে যে, হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মনে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্, হযরত ত্বালহা ও হযরত যুবায়র এবং হযরত মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহার মতো শীর্ষ পর্যায়ের সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ ছিলো; অথচ হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত সাহাবী সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

فَمَنْ اَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِىْ اَبْغَضَهُمْ

অর্থ: যে ব্যক্তি সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো, সে আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণের কারণেই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করলো।

তদুপরি, তাদের এ অভিযোগ হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্, হযরত ত্বালহা ও হযরত যুবায়র প্রমুখের উপরও বর্তাবে। সুতরাং এ অভিযোগ তো অমূলকই, তাছাড়া, হযরত আমীর মু'আভিয়ার প্রতি বিদ্বেষের পরিণামও তাই হবে, যা অন্য সব সাহাবী ও আহলে বায়তের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের হবে। আর তা হবে অতিমাত্রায় ভয়ানক।

তাহক্বীক্বী জবাব হচ্ছে- হুযূর-ই আক্রামের আহলে বায়তের বিরোধিতারও তিনটি ধরন রয়েছে-১. তাঁদের বিরোধিতা এ জন্য হওয়া যে, তাঁরা হুযূর-ই আক্রামের আহলে বায়আত। এটা কুফরী। কারণ এতে পরোক্ষভাবে হুযূর-ই আক্রামের প্রতি শত্রুতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

২. কোন পার্থিব কারণে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা। এ'তে যদি অহংকার সামিল থাকে তাহলে মহাপাপ; অন্যথায় নয়। অনেক সময় ঘরোয়া ব্যাপারে হযরত আলী এবং হযরত ফাতিমা যাহরার মধ্যেও মনমালিন্য হয়ে যেতো। হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শাহাদতের দিন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মুখমন্ডলে থাপ্পর মেরেছিলেন, তাঁর প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অবহেলা হয়েছে মনে করে। একবার হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফতকালে হযরত আব্বাস ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মধ্যে ভীষণ মন কষাকষি হয়েছিলো।

[সূত্র. মুসলিম শরীফ]

হযরত আব্বাস হযরত আলীর শানে অনেক কঠোর শব্দও ব্যবহার করে ফিলেছিলেন। এ ধরনের ঘটনা অহরহ সংঘটিত হচ্ছে। এ'তে অপরাধও নেই, গুনাহ্ও নেই।

৩. কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে আহলে বায়তের বিরোধিতা সম্পন্ন হয়ে যাওয়া। এটাও কোন অপরাধ কিংবা গুনাহর কারণ নয়; কেবল ভুল বুঝাবুঝি মাত্র।

সুতরাং তাঁদের ওইসব যুদ্ধও এ তৃতীয় প্রকারের ছিলো। তাঁদের অন্তরগুলো হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পবিত্র ছিলো। তাঁরা কোন ভুল বুঝাবুঝির কারণে পরস্পর যুদ্ধ করলেও আবার একে অপরের প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন। তাঁদের পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া-তোহফার আদান-প্রদানও হতো।

একটি ঘটনা

'ইস্তী'আব' নামক গ্রন্থে বর্ণিত, ঐতিহাসিক উষ্ট্রের যুদ্ধের পর হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহা (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা)-এর লাশের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার পক্ষে ছিলেন। তাঁকে আমর ইবনে জারমূয নামের, হযরত আলীর এক সিপাহী হত্যা করেছিলো। তাঁর লাশ দেখে হযরত আলী কেঁদে উঠলেন এবং 'ইন্না-লিল্লাহ্' পড়লেন। তারপর বললেন, "হে মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহা! তুমি বড় মুত্তাক্বী নামাযী ছিলে।" আর তাঁর তলোয়ার দেখে বললেন, "আল্লাহরই শপথ, এ তলোয়ার হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অনেক সাহায্য করেছিলো।" এরপর তিনি বললেন, "তাকে কে হত্যা করেছে?" তখন আমর ইবনে জারমূয পুরস্কার লাভের আশায় এগিয়ে এলো। আর সগর্বে বললো, "আমি হত্যা করেছি।" তারপর হত্যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দিলো। তখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি জাহান্নামী?" আমি হুযূর-ই আক্রামকে এরশাদ করতে শুনেছি, "মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহার হত্যাকারী জাহান্নামী।" এটা শুনে আমর ইবনে জারমূয অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলো এবং বললো, "হে আলী, এ কেমন কথা? আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেও দোযখী, আর আপনার পক্ষে যুদ্ধ করলেও দোযখী!" এটা বলে সে ওই তলোয়ার, যা দিয়ে মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহাকে হত্যা করেছিলো, নিজের পেটে ঢুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করলো অর্থাৎ কাফির হয়ে মারা গেলো। [আন্ না-হিয়াহ্]

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আহলে বায়ত তথা হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শত্রু ছিলেন না; নিছক বিরোধিতাকারী ছিলেন। বস্তুত শত্রু ও বিরোধিতাকারীর মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান রয়েছে। শত্রু তো স্বীয় প্রতিপক্ষের জান-মান, ইয্যাত-সম্মান, এমনকি ধর্মেরও দুশমন হয়ে থাকে; সে এগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়। আর বিরোধিতাকারী হচ্ছে- কোন বিষয়ে ভিন্নমত পোষণকারী; যদিও এ ভিন্নমত পোষণ পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া ও যুদ্ধ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায়। এ ভিন্নমতের কারণে পিতা-পুত্র, স্বামী-স্ত্রী ও ভাই-ভাই-এর মধ্যে অহরহ ঝগড়া বিবাদ হয়ে থাকে। সুলতান গাযী মুহিউদ্দীন আওরঙ্গযেব আলমগীর (আলায়হির রাহমাহ্)-ও তাঁর ভাইদের মধ্যে বিশেষ করে দারাশিকোর মধ্যে এ মতের বিরোধের কারণে ভীষণ যুদ্ধও হয়ে গিয়েছিলো, এতদ্সত্ত্বেও তাঁরা মুসলমানও ছিলেন, পরস্পর ভাইও ছিলেন; দুশমন ছিলেন না।

দ্বিতীয়ত, বাদশাহ্ আওরঙ্গযেব ভিন্নমতের কারণে আপন পিতা শাহজাহানকে নযরবন্দী করেছিলেন। এরপরও পরস্পর শত্রু ছিলেন না; বরং পিতা-পুত্র ছিলেন। ক্বোরআন মজীদ মতবিরোধ ও দুশমনীর মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছে। যেমন ঝগড়া-বিবাদকারী মুসলমানদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ

তরজমা: মুসলমান-মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই; সুতরাং আপন দু' ভাইয়ের মধ্যে সন্ধি করিয়ে দাও। [সূরা হুজুরাত: আয়াত-১০, কানযুল ঈমান]

তৃতীয়ত, জান-মাল ও ঈমানী শত্রুদের সম্পর্কে এরশাদ হয়েছে-

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

তরজমা: হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কিছু সংখ্যক স্ত্রী ও সন্তান তোমাদের শত্রু। সুতরাং তাদের থেকে সতর্ক থাকো। [সূরা তাগ্বাবুন: আয়াত-১৪, কান্যুল ঈমান]

লক্ষ্য করুন, উপরোক্ত আয়াত দু'টির মধ্যে প্রথম আয়াতে ঝগড়া-বিবাদ হওয়া সত্ত্বেও অপরিচিত মুসলমানদেরকে 'ভাই-ভাই' বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয় আয়াতে দ্বীনের বিরোধী সন্তান ও স্ত্রীদেরকে শত্রু সাব্যস্ত করে তাদের থেকে দূরে সরে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন।

চতুর্থত, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইয়েরা হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর বিরোধিতা ও তাঁর উপর অনেক অত্যাচার-নির্যাতন করেছিলেন। এতদসত্ত্বেও হযরত ইয়াক্বুব ও ক্বোরআন-ই করীম তাঁদেরকে

হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর শত্রু হিসেবে গণ্য করেননি। কারণ, তাঁরা তাঁর জান ও ঈমানের শত্রু ছিলেন না; বরং হযরত ইয়াক্বূব আলায়হিস্ সালাম হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামকে তাঁদের চেয়ে অধিক স্নেহ করতেন বলে তাঁর বিরোধিতা করেছিলেন। এতদ্সত্ত্বেও হযরত ইয়ূসুফের ভাইদেরকে পবিত্র ক্বোরআন আসমানের নক্ষত্ররাজি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এরশাদ হয়েছে-

يَا اَبَتِ اِنِّیْ رَاَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَاَيْتُهُمْ لِیْ سٰجِدِيْنَ

তরজমা: হে আমার পিতা, আমি এগারটা নক্ষত্র, সূর্য ও চন্দ্র দেখেছি; আমি সেগুলোকে দেখলাম যে, আমাকে সাজদা করছে।

[সূরা ইয়ূসুফ: আয়াত-৪, কান্যুল ঈমান]

দেখুন, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইদের চরম বাড়াবাড়ি ও অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁদেরকে নক্ষত্ররাজির আকারে দেখানো হয়েছে; অর্থাৎ হিদায়তকারী ও হিদায়তপ্রাপ্ত।

হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ ফরমান- "আমার সাহাবীগণ নক্ষত্ররাজির মতো। তাদের মধ্যে যার অনুসরণই করবে, হিদায়ত পেয়ে যাবে।"

সুতরাং হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর বিরোধিতাগুলো সত্ত্বেও রসূলে করীমের সাহাবী হিদায়তাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাছাড়া, হযরত ইয়াক্বূব আলায়হিস্ সালাম হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইদেরকে নিজের ও হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর দুশমন মনে করেননি। অন্যথায়, তাদের উপর কুফরীর ফাত্ওয়া দিতেন এবং ঘরবাড়ি থেকে বের করে দিতেন। কারণ, নবীর প্রতি দুশ্মনী হচ্ছে কুফ্রী আর কাফিরদের সাথে সংশ্রব হারাম। হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালামও তাঁর ভাইদেরকে নিজের দুশমন সাব্যস্ত করেননি; বরং প্রথমবার যখন তারা রসদের জন্য এসেছিলেন। তখন তাঁদের যথাযথ সমাদর ও আতিথ্য করেছিলেন। দেখুন, নবীর প্রতি দুমশন তো কাফির হয়ে থাকে, তাদের প্রতি সমাদর ও বিশেষ আতিথ্য কিভাবে? হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইয়েরাও তাঁর নিকট ক্ষমা চাওয়ার সময় বলেছিলেন-

قَالُوْا تَاللّٰهِ لَقَدْ اٰثَرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِيْنَ

তরজমা: তারা বললো, আল্লাহরই শপথ, নিশ্চয় আল্লাহ্ আপনাকে আমাদের উপর প্রধান্য দিয়েছেন এবং নিশ্চয় আমরা অপরাধী ছিলাম।

[সূরা ইয়ূসুফ: আয়াত-৯১, কান্যুল ঈমান]

হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইয়েরাও তাঁদের কুফরের কথা বলেননি; বরং নিজদেরকে কেবল দোষী বলেছেন। হযরত ইয়ূসুফও তাঁদেরকে তাওবা করার নির্দেশ দেননি, বরং বলেছেন-

قَالَ لَا تَثْرِيْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ؕ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ

তরজমা: "বললো, আজ তোমাদেরকে কোনরূপ তিরস্কার করা হবে না; আল্লাহ্ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন! [সূরা ইয়ূসুফ: আয়াত-৯২]

তাঁদের আচরণগুলো যদি কুফরী হতো, তা হলে তাঁদেরকে পুনরায় মুসলমান করা হতো, তাদের বিবাহ নবায়ন করানো হতো।

পঞ্চমত: হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম তাঁর স্ত্রী হযরত হাজেরা ও হযরত ইসমাঈলকে মক্কার তদানীন্তনকালীন দানা-পানি ও ছায়াবিহীন মরুভূমিতে রেখে গিয়েছিলেন। এটাতো আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে, অগণিত হিকমতের বহিঃপ্রকাশের জন্য তিনি এমনটি করেছিলেন। কিন্তু কেউ কেউ বলেছে, তিনি নাকি হযরত সারার, হযরত হাজেরার প্রতি বিরোধিতার কারণে এমনটি করেছিলেন। তা যদি কিছুক্ষণের জন্য মেনেও নেওয়া হয়, তবুও এখানে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে- তজ্জন্য তো হযরত সারাকে না কাফির সাব্যস্ত করা হয়েছে, না ফাসিক্ব। তাদের কথা মতো তা ছিলো নিছক বিরোধিতাই।

হযরত আলী ও হযরত আমীর মু'আভিয়ার ব্যাপারও একই ধরনের। যাঁরা হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরোধিতা করেছেন, যেমন হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্, হযরত ত্বালহা, হযরত মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহা প্রমুখ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা ওয়া আনহুম, তাঁদের সাথে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই আচরণ করেছেন, যা প্রিয়জন করে থাকেন। আর যাঁরা তাঁর বিরোধিতা করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন, যেমন, হযরত ত্বালহা, মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহা ও যুবায়র প্রমুখ, তাঁরা জান্নাতী হবার সুসংবাদ খোদ্ হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু দিয়েছেন। আর যাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি বিরোধিতা, এমনকি সংঘাতরত ছিলেন, যেমন আমীর মু'আভিয়া প্রমুখ, তাঁদের সম্পর্কে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেছেন, "তাঁরা আমাদের ভাই। আমাদের বিদ্রোহী হয়ে গেছে।" তাঁদের ধন-সম্পদও বাজেয়াপ্ত করেননি, তাঁদেরকে বন্দিও করেন নি এবং তাঁদের বেলায় শত্রুদের আহকাম (বিধানাবলী)ও জারী করেননি।

হযরত আমীর মু'আভিয়া কর্তৃক বিরোধিতার কারণ

এ বিষয়টি সবার জানা থাকা দরকার যে, শেষ পর্যন্ত হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতবিরোধ কী হয়েছিলো এবং কেন হয়েছিলো। একথা সুস্পষ্ট যে, মারওয়ানের অবিশ্বস্ততার কারণে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকরসহ মিশর থেকে আগত অভিযোগকারীরা মদীনা মুনাওয়ারায় পুনরায় ফিরে আসে। খলীফা হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে প্রথমে ভুল বুঝে, পরে মারওয়ানকে তাদের হাতে শাস্তি দেওয়ার দাবী করলো; কিন্তু বিচার বিভাগের পরিবর্তে জনগণের হাতে বিচারের ভার তুলে দিতে অস্বীকৃতি জানালে তারা হযরত ওসমানের অবাধ্য হয়ে গেলো এবং বিদ্রোহী বেশে তারা তাঁর ঘরকে ঘেরাও করে ফেলে। তিনদিন বা ততোধিক সময় ধরে তারা তাঁর পানি পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিলো। এদিকে খলীফা এ মুহূর্তে ধৈর্যধারণ ও মদীনাতুর রসূলকে রক্তপাতমুক্ত রাখাকে শ্রেয় মনে করে, হযরত আলী প্রমুখ সাহাবা-ই কেরামকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপ নিতে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁরা কোন কার্যকর পদক্ষেপও নিতে পারছিলেন না; কিন্তু ওদিকে সুযোগ করে নিয়ে খলীফার ঘরে প্রবেশ করে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকরসহ তেরজন বিদ্রোহী তাঁকে নির্দয়ভাবে শহীদ করলো।

তারপর মদীনা শরীফের মুসলমানদের সামনে সর্বপ্রথম দায়িত্ব আসলো খলীফা নিয়োগ করা। সুতরাং আনসার ও মুহাজিরদের সর্বসম্মত রায়ে আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খলীফা-ই বরহক্ব মনোনীত হলেন। খলীফা হওয়ার পর হযরত আলী কার্রামাল্লাহু তা'আলা ওয়াজহাহুর সামনে হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হত্যাকারীদের বিচারসহ রাজ্যের শান্তি-শৃংখলা ফিরিয়ে আনার বহুবিধ দায়িত্ব এসে পড়লো। সুতরাং তিনি অতি সুনিপুণতার সাথে রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার দিকে মনোনিবেশ করলেন।

অবশ্য বিভিন্ন অনিবার্য কারণে হযরত ওসমান হত্যার বিচারকার্য ও হত্যাকারীদের শাস্তির বিধান কিছুটা বিলম্বিত হচ্ছিলো। এদিকে সিরিয়ার গভর্নর আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মনে কুচক্রী মহল এ ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টায় মেতে উঠলো যে, 'হযরত আলী মুর্তাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু নাকি ইচ্ছাকৃতভাবে হযরত ওসমান হত্যার ক্বিসাস কার্যকর করতে গড়িমসি করছেন, এমনকি, না'ঊযুবিল্লাহ্ এ জঘন্য ও অত্যন্ত দুঃখজনক হত্যাকান্ডে তাঁরও হাত রয়েছে এবং তাঁর হত্যাকারীদেরকে পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে ভর্তি করিয়ে নেওয়া হচ্ছে।'

সুতরাং হযরত আমীর মু'আভিয়ার তরফ থেকে বারংবার ওই জঘন্য হত্যাকান্ডটির প্রতিশোধ নেওয়ার দাবী জানানো হচ্ছিলো। তখনো তাঁর হযরত আলীর খিলাফতকে অস্বীকার করার কিংবা স্বীয় রাজত্বকে পৃথক করে নেওয়ার চিন্তা-ভাবনা ছিলোনা; কেবল হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রক্তের প্রতিশোধ নেওয়ার দাবীই ছিলো।

শেষ পর্যন্ত এ বিরোধ এমন অবস্থার সৃষ্টি করলো যে, হযরত আমীর মু'আভিয়া মনে করতে লাগলেন যে, হযরত আলী মুর্তাদ্বা নাকি খিলাফতেরই উপযুক্ত নন এবং তিনি নাকি খিলাফতের দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করতে পারছেন না। তিনি মনে করতে লাগলেন যে, যিনি এমন একটি জঘন্য হত্যাকান্ডের প্রতিশোধ নিতে পারছেন না, তিনি খিলাফতের অন্যান্য দায়িত্ব কিভাবে পালন করবেন? তাঁদের উভয়ের মতবিরোধের মূল কারণ ছিলো এটাই। অন্যান্য বিরোধগুলো এরই শাখা-প্রশাখা। বাস্তবিকপক্ষে হত্যাকান্ডটির বিচার কার্য বিভিন্ন জটিলতায় পর্যবশিত হয়েছিলো, যার ফলে ভুল বুঝাবুঝির দানা ডালপালা মেলছিলো।

উল্লেখ্য, হযরত ওসমানের হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে সাহাবা-ই কেরাম ক্রমশ: তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে যান: ১. একদল নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেন, তাঁরা কারো পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি। তাঁরা হলেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম প্রমুখ। ২. একদল হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিপক্ষে যান। যেমন- হযরত আয়েশা, হযরত ত্বালহা, হযরত যুবায়র, হযরত মুহাম্মদ ইবনে ত্বালহা ও হযরত আমীর মু'আভিয়া প্রমুখ। ৩. আরেক দল হযরত আলী মুরতাদ্বার পক্ষ অবলম্বন করেন।

আরো লক্ষ করা যায় যে, হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ যখন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিপক্ষে, তখন তাঁর আপন ভাই হযরত আবদুর রহমান ইবনে আবূ বকর হযরত আলীর সেনাবাহিনীর সদস্য ছিলেন। আবার হযরত আলীর ভাই হযরত আক্বীল ওই যুদ্ধের (জঙ্গে জমল) সময় নিরপেক্ষ

ভূমিকা পালন করেন, তিনি হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অনুমতি নিয়ে হযরত আমীর মু'আভিয়ার ঘরে মেহমান হয়ে থাকেন, যা ইতোপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে।

আপত্তি নং-৩.

হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রক্তের ক্বিসাস দাবী করার অধিকার হযরত আমীর মু'আভিয়ার ছিলো কিনা? প্রত্যেকেতো এ দাবী করতে পারে না; এটাতো নিহত ব্যক্তির আপনজনদেরই অধিকার!

খন্ডন

হযরত ওসমান গনী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মুসলমানদের খলীফা ছিলেন। আর খলীফা রাজ্যের সমস্ত জনগণের আপনজনই হয়ে থাকেন। ইসলামী বাদশাহ্ (রাষ্ট্র প্রধান)-এর রক্তের বদলা প্রত্যেক মুসলমান দাবী করতে পারে। তা না হলে কোন বাদশাহ্ বা রাষ্ট্র প্রধানের জীবন, এমনকি কোন শাসকের জীবনও নিরাপদ হবে না। হযরত আমীর মু'আভিয়া তো হযরত ওসমানের বংশগত আপনজনও ছিলেন। কেননা, তিনি হযরত ওসমানের নিকটাত্মীয় ছিলেন। বংশীয় ধারার এক পর্যায়ে উমাইয়া ইবনে আবদে শামসে গিয়ে হযরত ওসমান ও আমীর মু'আভিয়ার বংশীয় শাজরা মিলিত হয়ে যায়। যেমন- হযরত ওসমান ইবনে আফ্ফান ইবনে আবী আলিহয়াস ইবনে উমাইয়া ইবনে আবদে শামস্ ইবনে আবদে মান্নাফ। বর্ণিত আছে যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও হযরত আমীর মু'আভিয়ার এ দাবীর সমর্থন করেছিলেন এবং সহসা এ দাবী পূরণ করতে না পারলে তিনি সমূহ বিপদেরও আশংকা করেছিলেন।

আপত্তি নং-৪.

আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর জীবদ্দশায় ইয়াযীদকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত নিয়োগ করে গিয়েছিলেন। এ'তে তাঁর তিনটি বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে- এক. খলীফার মনোনয়ন জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে হওয়া চাই, দুই. নিজের ছেলেকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করা ইসলামী কানূনের বিপরীত। এবং তিন. ফাসিক্ব, ফাজির ও অযোগ্য ছেলের হাতে রাজ্য শাসনের দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া মোটেই উচিৎ হয়নি। কারবালার সমস্ত অঘটনের দায়িত্ব এ কারণে

হযরত আমীর মু'আভিয়ার উপর বর্তায়। ফাসিক্ব-ফাজিরকে যেখানে নামাযের ইমাম বানানো যায়না, সেখানে সমগ্র রাজ্যে মুসলমানদের ইমাম (শাসক) বানানো কিভাবে শুদ্ধ হতে পারে?

খন্ডন

এ তিনটি আপত্তিই মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। প্রথম আপত্তি হলো খলীফার জীবদ্দশায় অন্য কাউকে খলীফা নিয়োগ করা বৈধ কিনা? এটাতো বৈধ। কারণ, খিলাফতের কয়েকটা নিয়ম হচ্ছেঃ ১. জন সাধারণের রায়ে খলীফা হওয়া, যেমন সিদ্দীক্ব-ই আক্বরের খলীফা হওয়া, ২. প্রথম খলীফার মনোনয়ন দ্বারা খলীফা হওয়া, যেমন হযরত ওমর ফারূক্বের খিলাফত, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁকে খলীফা মনোনীত করেন, ৩. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মনোনয়ন দ্বারা খলীফা হওয়া, যেমন হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার খিলাফত। আমীর মু'আভিয়াও তন্মধ্যে এক পদ্ধতিতে পরবর্তী শাসক নিয়োগ করেছিলেন। সুতরাং তাঁর পরবর্তী শাসক নিয়োগ করা আপত্তিকর হতে পারে না। পবিত্র ক্বোরআন ও হাদীসে এর নিষেধ আসেনি। আল্লাহর বিশেষ বান্দাগণও এমনটি করেছেন। আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আগে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলেন। পুত্রের খলীফা হওয়া হযরত হাসান থেকে আরম্ভ হয়েছে। হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করেছিলেন যেন তাঁর ভাই হযরত হারূনকে তাঁর উজির করে দেন-

وَاجْعَل لِّيْ وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِيْ (২৯) هَارُونَ أَخِيْ (৩০) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِيْ (৩১)وَأَشْرِكْهُ فِيْ أَمْرِيْ(৩২)

তরজমা: ২৯. আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন উজির করে দাও। ৩০. সে কে? আমার ভাই হারূন, ৩১. তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করো। ৩২. এবং তাকে আমার কর্মে অংশীদার করো। [সূরা ত্বোয়াহা]

তাঁর এ দো'আ কবূল হয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত মূসা আলায়হিস্ সালামকে আপনজনের পক্ষে দো'আ করার জন্য তিরস্কার করেন নি।

হযরত যাকারিয়া আলায়হিস্ সালাম আল্লাহর দরবারে সন্তান কামনা করেছেন এবং দো'আ করেছেন, তাঁর ওই সন্তান যেন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়। এ দো'আ

কবূল হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- (হযরত যাকারিয়া প্রার্থনা করেছেন-)

فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

তরজমা: সুতরাং আমাকে তোমার নিকট থেকে এমন কাউকে দান করো, যে আমার কাজ সম্পাদন করবে। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়া'কুবের বংশধরদের উত্তরাধিকারী হবে এবং ইয়া'কুবের বংশধরদের উত্তরাধিকারী হবে।

[সূরা মারইয়াম: আয়াত-৫-৬]

বাকী রইলো হযরত আমীর মু'আভিয়ার ইয়াযীদকে চয়ন করা। কারণ ইয়াযীদ তো ফাসিক্ব-ফাজির (পাপাচারী)ছিলো। এর জবাব হলো-

প্রথমত, এটা প্রমাণিত নয় যে, আমীর মু'আভিয়ার জীবদ্দশায় ইয়াযীদ ফাসিক্ব ও ফাজির ছিলো আর আমীর মু'আভিয়া জেনে শুনে তাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেছেন। ইয়াযীদের পাপাচার হযরত আমীর মু'আভিয়ার ওফাতের পর প্রকাশ পেয়েছিলো। ভবিষ্যতের পাপাচারের জন্য বর্তমানে কাউকে পাপী বলা যায় না। দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা শয়তানকে তার কুফরী প্রকাশের পর ফেরেশতাদের জমা'আত থেকে বের করেছেন। এর আগে তাকে তার পদে বহাল রেখেছিলেন। তখন তাকে সম্মান করা হতো। সুতরাং ইয়াযীদের, পরবর্তী মন্দ আমলগুলোর জন্য হযরত আমীর মু'আভিয়ার প্রতি দোষারোপ করা যাবে না।

দ্বিতীয়ত, যদি এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় যে, আমীর মু'আভিয়া ইয়াযীদের পাপাচারের কথা জানা সত্ত্বেও তাকে খলীফা (শাসক) মনোনীত করেছেন, তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাবে যে, ওই বর্ণনা মিথ্যা ও বানোয়াট আর ওই বর্ণনাকারী হয়তো শিয়া কিংবা সাহাবা-ই কেরামের দুশমন। সুতরাং শিয়া-রাফেযীদের বর্ণনা শরীয়ত মতে গ্রহণযোগ্য নয়। তদুপরি, সাহাবা-ই কেরামের তাক্বওয়া-পরহেযগারী যেখানে পবিত্র ক্বোরআন ও সহীহ্ হাদীস শরীফ দ্বারা প্রমাণিত, সেখানে ক্বোরআন-হাদীসের মোকাবেলায় কোন বর্ণনাকারীর বর্ণনার কী বাস্তবতা ও গ্রহণযোগ্যতা থাকতে পারে?

তৃতীয়ত, কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, হযরত আমীর মু'আভিয়া জনগণ থেকে ইয়াযীদের প্রতি সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছিলেন। ইতিহাসের এ বর্ণনাও কতটুকু সত্য ও সঠিক তা নিশ্চিত নয়।

অতএব, এসব বর্ণনা থেকে একথা প্রতীয়মান হয় যে, এ আপত্তি (আমীর মু'আভিয়া ইয়াযীদের পাপাচারিতা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাকে খলীফা করলেন কেন?) অমূলক ও ভিত্তিহীন।

এখানে জেনে রাখা দরকার যে, আমীর মু'আভিয়ার জীবদ্দশায় তাঁর সাথে ইমাম হাসানের একটি সন্ধি হয়েছিলো। সন্ধির সময় আমীর মু'আভিয়া ইমাম হাসানের নিকট অলিখিত কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আর বলেছিলেন, "আপনার ইচ্ছানুসারে শর্তাবলী লিখতে পারেন। আমি মেনে নেবো।"

[সূত্র. আন্-নাহিয়াহ্, সাওয়া-'ইক্বে মুহরিক্বাহ্ ইত্যাদি]

সুতরাং সন্ধিপত্রে এটি লিখা হয়েছিলো যে, আমীর মু'আভিয়ার পর খলীফা হবেন ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা। এ শর্তও আমীর মু'আভিয়া মেনে নিয়েছিলেন। [প্রাগুক্ত]

সহীহ্ বোখারী শরীফে হযরত হাসান বসরীর বরাতে উল্লেখ করা হয় যে, এক পর্যায়ে ইমাম হাসান এক বিশাল বাহিনী নিয়ে আমীর মু'আভিয়ার মোকাবেলায় এসেছিলেন। তখন আমীর মু'আভিয়া আমর ইবনুল আসকে ডেকে বলেছিলেন, "উভয় বাহিনীতো আমাদের মুসলমান। সুতরাং তাদের মধ্যে যেই নিহত হোক সে শহীদ হবে এবং তাদের পরিবারের লালন-পালনের দায়িত্ব বর্তাবে রাষ্ট্রের উপর। তাই যে কোন উপায়ে সন্ধি করে নেওয়া-ই শ্রেয় হবে।" সুতরাং আমীর মু'আভিয়া আবদুর রহমান ইবনে সামুরা এবং আবদুর রহমান ইবনে আমির ক্বরশীকে সন্ধির জন্য পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁদেরকে এ ব্যাপারে পূর্ণ ক্ষমতাও দিয়েছিলেন। সুতরাং সন্ধিও হয়েছিলো। ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর আরোপিত শর্তাবলীও তাঁরা মেনে নিয়েছিলেন। এ সন্ধি হয়েছিলো ৪১ হিজরীর রবিউল আউয়াল মাসে।

অবশ্য, এ সন্ধিতে অসন্তুষ্ট হয়ে এক ব্যক্তি হযরত ইমাম হাসানকে বলেছিলো, "আপনি এর মাধ্যমে মুসলমানদের অপদস্থ করেছেন।" ইমাম হাসান তার জবাবে বলেছিলেন, "আমি মুসলমানদের অপদস্থ করিনি; বরং তাদের মান এবং মাল ও ইয্যতকে হিফাযত করেছি। আমি আমার আব্বাজান (হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা আমীর মু'আভিয়ার শাসনকে মন্দ মনে করোনা। কেননা, আমার পর আমীর মু'আভিয়া স্বতন্ত্র (একচ্ছত্র) আমীর হয়ে যাবে। আর আমীর মু'আভিয়ার পর এমন ফিৎনা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হবে যে, মানুষের মস্তকসমূহ তীরের মাথায় দেখা যাবে।

[কিতাবুন্ নাহিয়াহ্]

অতঃপর তিনি (ইমাম হাসান) কূফা থেকে মদীনা শরীফে চলে আসেন এবং ওখানেই ইনতিক্বাল করার পূর্ব পর্যন্ত বসবাস করেন। এ থেকে হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বেলায়ত তথা বাত্বেনী ইলমের প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ, তিনি যে ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন, তা বাস্তবে সংঘটিত হয়েছে।

এসব বিবরণ থেকে একথাও প্রমাণিত হয় যে, আমীর মু'আভিয়ার ইন্তিক্বালের সময় ইমাম হাসান জীবিত থাকলে তিনিই স্বতন্ত্র খলীফা হতেন। পূর্ব থেকে ইয়াযীদকে খলীফা বানানোর ইচ্ছা থাকলে তিনি ইমাম হাসানের ওই শর্তটুকু মেনে নিতেন না। তিনি আহলে বায়তে রসূলের দুশমন হলে তাঁর পরে ইমাম হাসানের খিলাফতের ব্যাপারে কখনো রাজি হতেন না।

আল্লামা আবূ ইসহাক্ব 'নূরুল আইন ফী মাসজিদিল হোসাঈন' নামক গ্রন্থে লিখেছেন- আমীর মু'আভিয়া ইমাম হোসাঈনকে মদীনা মুনাওয়ারার শাসক নিয়োগ করেছিলেন। তাঁকে শাহী কোষাগারের মালিকও করে দিয়েছিলেন। এ গ্রন্থে আমীর মু'আভিয়ার ওসীয়ৎ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। এর কিছুটা নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

যখন আমীর মু'আভিয়ার ইন্তিক্বালের সময় ঘনিয়ে এলো, তখন ইয়াযীদ বললো, "আব্বাজান, আপনার পর খলীফা কে হবে?" তদুত্তরে তিনি বললেন, "খলীফা তো তুমিই হবে। তবে আমি যা বলছি তা মনযোগ সহকারে শোন! কোন কাজ ইমাম হোসাঈনের পরামর্শ ব্যতীত করো না। তাঁকে না খাইয়ে, তুমি খেয়োনা, তাঁকে পান না করিয়ে তুমি পান করোনা। সবার আগে তাঁর জন্য খরচ করবে। তারপর অন্যান্য ব্যাপারে খরচ করবে। তাঁকে পরিধান করিয়ে নিজে পরিধান করবে। আমি তোমাকে ইমাম হোসাঈন, তাঁর পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বরং সমস্ত হাশেমী বংশের সাথে সদ্ব্যবহার করার জন্য ওসীয়ৎ করছি।

হে আমার বৎস! খিলাফতের ক্ষেত্রে আমাদের অধিকার নেই। সেটা ইমাম হোসাঈন, তাঁর পিতা ও তাঁর বংশের অধিকার। তুমি কিছুদিনের জন্য খলীফা থাকবে। তারপর ইমাম হোসাঈন যখন পূর্ণ উপযোগী হয়ে যাবে, তখন তিনিই খলীফা হবেন অথবা তিনি যাঁকে খলীফা করবেন তাঁর কাছে যেন তখন খিলাফত পৌঁছে যায়। আমরা সবাই ইমাম হোসাঈন ও তাঁর নানাজানের গোলাম। তাঁকে

অসন্তুষ্ট করোনা। তাঁকে অসন্তুষ্ট করলে তোমার উপর আল্লাহর রসূল অসন্তুষ্ট হবেন। তখন তোমার শাফা'আত কে করবে?"

এ ওসীয়ৎনামা অনেক দীর্ঘ। উপরোক্ত বর্ণনা সেটার একটা অংশ মাত্র। সুতরাং চিন্তা করুন! অন্যান্য ইতিহাসগ্রন্থে যা উল্লেখ করা হয়েছে, তা এর মোকাবেলায় কতটুকু গ্রহণযোগ্য হতে পারে? আমরা সত্যপন্থী মুসলমান। সেসব বর্ণনায় সাহাবা-ই রসূলের মর্যাদা রক্ষা হয়, সেগুলোই আমরা গ্রহণ করবো। পবিত্র ক্বোরআন-হাদীসেতো সাহাবা-ই কেরামের মহা মর্যাদার কথা স্পষ্টভাষায় বর্ণিত হয়েছে। ভুল ইতিহাস গ্রহণ করে আমরা আমাদের ক্ষতি করতে যাবো কেন?

আপত্তি নং- ৫

আমীর মু'আভিয়া ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগ করেছিলেন। ফলে তিনি শাহাদত বরণ করেন। এ কাজটাও তিনি ইয়াযীদকে খলীফা বানানোর জন্য করেছিলেন।

খন্ডন

বিষ প্রয়োগকারী সম্পর্কে যেখানে খোদ্ ইমাম হাসান ও সম্মানিত আহলে বায়তে কেরাম সন্দিহান ছিলেন, তাঁরা কিংবা অন্য কেউ নির্দিষ্ট করে বলেননি কে বাস্তবে এ অপকর্ম করেছিলো। সেখানে আপত্তিকারী কিভাবে এত নিশ্চয়তার সাথে বললো যে, আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এমন একটি জঘন্য কাজ করিয়েছিলেন?

বস্তুত: বিষ প্রয়োগকারীকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি বিধায় এজন্য কাউকে শাস্তিও দেওয়া যায়নি। খোদ্ হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত হাসানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তখন তিনি বলেছিলেন, "যার সম্পর্কে আমার সন্দেহ, সে যদি সত্যি আমাকে বিষ দিয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে শাস্তি দেবেন। আর যদি সে তেমন না হয়, তাহলে বিনা দোষে কাউকে শাস্তি দেবে কেন?" এখন বলুন, আপত্তিকারী কোন্ পর্যায়ে পড়ে? একেই বলা হয় 'মন্দ ধারণা'। এটা মারাত্মক অপরাধ বা গুনাহ্। আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান- اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ (নিশ্চয় কতেক ধারণা পাপ)। যখন সাধারণ মুসলমানের বেলায় এ মন্দ ধারণা পাপ, তখন একজন সাহাবী-ই রসূলের প্রতি মন্দ ধারণা মহাপাপ ও জঘন্যতর গোনাহ্ তো হবেই।

আপত্তি-৬.

আমীর মু'আভিয়া হযরত আলীকে নিজেও গালি দিতেন এবং অন্য লোকদেরকেও গালি দিতে বলতেন। যেমন মুসলিম শরীফে হযরত সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস থেকে বর্ণিত, আমাকে একবার আমীর মু'আভিয়া বললেন, مَامَنَعَكَ اَنْ تَسُبَّ اَبَاالتُّرَابِ(আবূ তোরাব আলীকে গালি দিতে আপনাকে কোন জিনিষ বাধা দিচ্ছে)? হযরত সা'দ বললেন, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে হযরত আলী সম্পর্কে তিনটি কথা বলতে শুনেছি। তাই আমি কখনো তাঁকে গালি দেবো না। একটি হলো- হুযূর-ই আক্রাম হযরত আলীর উদ্দেশে বলেছেন, "তুমি আমার জন্য তেমনি, যেমন হযরত মূসা আলায়হিস্ সালাম-এর জন্য হযরত হারূন।" দ্বিতীয়টি হচ্ছে- হুযূর-ই আক্রাম খায়বারের দিন বলেছেন, "আমি আজ তাকেই ঝান্ডা প্রদান করবো, যে আল্লাহ্ ও রসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্ ও রসূল তাকে ভালবাসেন।" আর তৃতীয়টি হচ্ছে- "যখন 'মুবাহালার আয়াত' নাযিল হয়েছিলো, তখন হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী, হযরত ফাত্বিমা, হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈনকে নিজের সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন।"

সুতরাং এ কথা প্রসিদ্ধ যে, আহলে বায়তকে গালি দেওয়া- নিজে দিক কিংবা অন্য কারো মাধ্যমে দেওয়াকে, ফিসক্ব তথা পাপই। এতদ্ভিত্তিতে হযরত আমীর মু'আভিয়া ফাসিক্ব।

খন্ডন

আপত্তিকারী হাদীসটির মর্মার্থ বুঝেনি। আরবীতে سَبٌّ -এর অর্থ শুধু গালি দেওয়া নয়; বরং মন্দ বলাকে سَبٌّ বলা হয়। যেমন, আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ ফরমান-

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

তরজমা: তোমরা ওইসব লোককে মন্দ বলোনা না, যেগুলোর তারা আল্লাহ্ ব্যতীত পূজা করে, কেননা, তারা আল্লাহর শানে বেয়াদবী করবে সীমা লংঘন ও মুর্খতা বশত। [সূরা আন্'আম: আয়াত-১০৯, কান্যুল ঈমান]

এখানে سَبٌّ মানে গালি নয়। কেননা সাহাবা-ই কেরাম অকথ্যভাষায় গালি-গালাজ করেন না। তাঁরা অতি উচ্চ পর্যায়ের বুযুর্গ লোক। এখানে سَبٌّ মানে মন্দ বলা।

হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন- فَاَىُّ مُسْلِمٍ لَعَنْتُهٗ اَوْ سَبَبْتُهٗ فَاجْعَلْ لَهٗ زَكٰوةً وَّرَحْمَةً অর্থাৎ যে মুসলমানকে আমি অভিসম্পাত করেছি অথবা মন্দ বলেছি, তার জন্য সেটাকে পবিত্রতা ও রহমতে পরিণত করে দিন। এখানেও سَبٌّ মানে গালি দেওয়া নয়। কেননা হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র রসনা দিয়ে কখনো গালি বের হয়নি; হতেও পারে না। আমীর মু'আভিয়াও হযরত সা'দকে হযরত আলীকে গালি দেওয়ার কথা বলেন নি; বরং হযরত আলীর ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা কেন আলোচনা করেন না তা জিজ্ঞাসা করেছেন। অর্থাৎ তিনি হযরত সা'দকে হযরত আলীর সমালোচনা কেন করেন না, তা জানতে চেয়েছেন। প্রকারান্তরে, তিনি হযরত সা'দকে হযরত আলীর প্রশংসার বর্ণনা দিতে বলেছিলেন। এ কারণে, হযরত সা'দ যখন হযরত আলীর প্রশংসাগুলো বর্ণনা করছিলেন, তখন হযরত মু'আভিয়া নিরবে তা শুনেছিলেন। অন্যথায় তিনি এমনটি করতেন না; বরং নিজ থেকে ভাল-মন্দ কিছু বলতেন। কিন্তু তিনি তা মোটেই করেননি। কোন সাহাবীর এটা শান নয়। সাহাবা-ই কেরাম সম্পর্কে ভাল ধারণা রাখা উচিৎ। তাঁদের সম্পর্কে অন্য ধরনের কোন বর্ণনা পাওয়া গেলে তা অবশ্যই তা'ভীল (ভিন্ন ব্যাখ্যা)-এর যোগ্য। সব জায়গায় পবিত্র ক্বোরআনের আয়াত ও হাদীসগুলোর বাহ্যিক অর্থ গ্রহণ করা যায় না। কারণ, তখন আল্লাহ্ তা'আলা ও নবী করীমের বিপক্ষে অনেক ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হবার সম্ভাবনা থাকে। তখন মুসলমানের ঈমানও বিনষ্ট হতে পারে। এর বিস্তারিত বিবরণ হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী আলায়হির রাহমাহ্র 'ক্বহরে কিবরিয়া বর মুনকিরীনে 'ইসমতে আম্বিয়া'য় দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ আপত্তিটাও ভিত্তিহীন।

আপত্তি-৭.

আমীর মু'আভিয়াকে হুযূর-ই আক্রাম বদ-দো'আ দিয়েছেন। যেমন, মুসলিম শরীফে আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমাকে হুযূর-ই আন্ওয়ার সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মু'আভিয়াকে ডেকে আনতে বললেন, আমি ডাকতে গিয়ে দেখলাম তিনি খাবার খাচ্ছেন। আমি ফিরে এসে তা আরয করলাম। হুযূর-ই আক্রাম পুনরায় তাকে ডেকে আনতে বললেন। আমি পুনরায় এসে দেখলাম, তখনো তিনি খাবার খাচ্ছিলেন। আমি এসে তা আরয করলাম। তখন হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করলেন, " لَا اَشْبَعَ

اللّٰهُ بَطْنَهٗ (আল্লাহ্ তা'আলা তার উদরকে তৃপ্তি দান না করুন!)'' উল্লেখ্য, হুযূর-ই আক্রামের দো'আও মাক্ববূল এবং তাঁর বদ-দো'আও ক্ববূল। সুতরাং বলা যায় যে, আমীর মু'আভিয়ার উপর হুযূর-ই আক্রামের বদ-দো'আ রয়েছে।

খন্ডন

আপত্তিকারী হাদীসটার মর্মার্থ বুঝতে সক্ষম হয়নি। যেখানে হুযূর-ই আক্রাম তাঁকে গালিগালাজকারী ও তাঁর দিকে পাথর নিক্ষেপকারীদের বিপক্ষে দো'আ (বদ-দো'আ) করেননি, ওই মাহবূবে খোদা রাহমাতুল্লিল 'আলামীন ওখানে আমীর মু'আভিয়াকে বিনা দোষে কিভাবে বদ-দো'আ দিতে পারেন? খাবার খেতে দেরী হওয়া শর'ঈ ও রাষ্ট্রীয় আইনে গুনাহ্ কিংবা অপরাধ নয়। এটাও লক্ষণীয় যে, হযরত ইবনে আব্বাস হযরত আমীর মু'আভিয়াকে একথা বলেননি যে, সরকার-ই দু'আলম আপনাকে তলব করেছেন; বরং তিনি তাঁকে আহার করতে দেখে চুপিসারে ফিরে গেছেন এবং হুযূর-ই আক্রামকে তিনি যা দেখেছেন, তা-ই বলেছেন। সুতরাং এখানে না আমীর মু'আভিয়ার কোন দোষ আছে, না হুযূর-ই আক্রাম তাকে বদ-দো'আ করার কোন কারণ আছে। এখানে বদ-দো'আ করা অসম্ভব ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত, হুযূর-ই আক্রাম আমীর মু'আভিয়ার উদ্দেশে যা বলেছেন, তা বদ-দো'আ নয়; বরং আরবীতে এ ধরনের বাক্য আদর এবং মুহাব্বত করেও বলা হয়। এমন সব বাক্য দ্বারা বদ-দো'আ বুঝানো উদ্দেশ্য নয়। যেমন- আল্লাহ্ তা'আলা পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করেছেন-

اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا
وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا (٧٢)

তরজমা: নিশ্চয় আমি আমানত অর্পণ করেছি আসমানসমূহ, যমীন এবং পর্বতমালার প্রতি। অতঃপর সেগুলো তা বহন করতে অস্বীকার করলো এবং তাতে শঙ্কিত হলো, কিন্তু মানুষ তা বহন করলো। নিশ্চয় সে স্বীয় আত্মাকে কষ্টের মধ্যে নিক্ষেপকারী, বড় মূর্খ। [সূরা আহযাব: আয়াত-৭২, কান্যুল ঈমান]

দেখুন, মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার ওই আমানতও গ্রহণ করলো, যা আসমান, যমীন ও পর্ব্বতমালা গ্রহণ করার সাহস করেনি। এ জন্য আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে 'যালিম' ও 'জাহিল' বলে আখ্যায়িত করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, শব্দ দু'টি ক্রোধ প্রকাশের জন্য নয়; বরং করুণা প্রকাশের জন্যই এরশাদ হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম হযরত আবূ যার গিফারীর এক প্রশ্নের জবাবে এরশাদ করেছিরেন, رَغِمَ عَلٰی اَنْفِ اَبِیْ ذَرٍّ(আবূ যারের নাক মাটিযুক্ত হোক)! কাউকে হুযূর-ই আক্রাম বলেছেন ثَكِلَتْكَ اُمُّكَ (তোমাকে তোমার মা কাঁদাক)! কাউকে বলেছেন- قَاتَلَهُ اللّٰهُ(আল্লাহ্ যেন তাকে ধ্বংস করেন)! বিদায় হজ্জের সময় হুযূর-ই আক্রাম তাঁর এক স্ত্রী সম্পর্কে জানতে পারলেন যে, তাঁর মাসিক ঋতুস্রাব জারী হয়েছে। ফলে তিনি বিদায়ী তাওয়াফ করতে পারেননি। তখন তিনি তাঁর সম্পর্কে বললেন, عقری - حلقی (অপদার্থ, বাঁজা)।

সুতরাং বুঝা গেলো যে, এ ধরনের বাক্যাবলী ভালবাসা প্রকাশের জন্য, বদ-দো'আর জন্য নয়। আমাদের দেশেও নিজের স্নেহের ছেলেকে আদার করে বলা হয়- 'পাগল ছেলে, 'অথর্ব ছেলে' ইত্যাদি।

তদুপরি, আমীর মু'আভিয়ার উদ্দেশে হুযূর-ই আক্রামের উক্ত বাক্য বদ-দো'আ হয়নি বরং দো'আই হয়েছে। আর তা তাঁর শানে মক্ববূলও হয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে আল্লাহ্ তা'আলা আমীর মু'আভিয়াকে এত বড় করেছেন এবং এত বেশি ধন-দৌলতের মালিক করেছেন যে, তিনি লক্ষ লক্ষ লোকের পেট ভরিয়েছেন। কথায় কথায় তিনি কাউকে লক্ষ টাকা পুরস্কারও দিয়েছেন। কেননা, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন রব থেকে তাঁর বদান্যতার প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন, ''হে আমার মালিক ও মুনিব, আমি যদি কোন মুসলমানকে বিনা কারণে লা'নত বা বদ-দো'আ করে থাকি, তাহলে সেটাকে রহমত, সাওয়াব ও পবিত্রতার মাধ্যম করে দিন!'' এ হাদীস মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত। তাছাড়া, 'কিতাবুদ্ দা'ওয়াত'-এ হযরত আবূ হোরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, ''হে মুনিব, আমি যাকে ভুলে মন্দ বলে ফেলি, ক্বিয়ামতের দিন তার জন্য এ বদ-দো'আকে নৈকট্য লাভের ওসীলা (মাধ্যম) করে দিন!''

আপত্তি-৮.

আমীর মু'আভিয়া ও ইয়াযীদের অনেক কর্মকান্ডে সামঞ্জস্য বা মিল দেখা যায়, যেমন- আহলে বায়তকে জ্বালাতন করা এবং তাঁদের উভয়ের ঘর এক, পরিবার এক ইত্যাদি। অথচ আপনারা আমীর মু'আভিয়ার নাম নিয়ে 'রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহু' আর ইয়াযীদের নামের সাথে 'পলীদ' (নাপাক), 'মারদূদ' (ধিক্কৃত) ও 'পাপিষ্ঠ' ইত্যাদি বলে থাকেন। পিতাকে সম্মান করেন, আর পুত্রকে দোষারোপ করেন- এর কারণ কি?

খন্ডন

এ প্রশ্নের জবাব হযরত ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর নিকট পাওয়া যায়। তাঁর পদক্ষেপগুলো থেকে এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ও সুস্পষ্ট হয়ে যায়।

ইমাম হাসানের সাথে আমীর মু'আভিয়ার সন্ধির সময় ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু কোন আপত্তি করেননি; বরং সন্ধির পর তিনি আমীর মু'আভিয়ার হাতে হাত রেখে বায়'আত করেছিলেন। কিন্তু আমীর মু'আভিয়ার পর ইয়াযীদের হাতে হাত দেন নি; বরং তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে নিজের মস্তকটুকুও দিয়ে দিয়েছেন। এখানে আমীর মু'আভিয়া ও ইয়াযীদের মধ্যে যে বিরাট ব্যবধান রয়েছে তা প্রকাশ পায়। আমরা এ পার্থক্যের সমর্থক। পার্থক্যও নিম্নরূপ:

পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ স্বীয় রাজত্ব ও সিংহাসনের লোভে পবিত্র আহলে বায়তের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করেছে। শরীয়তের বিধান মতে সে খলীফা থাকার উপযুক্ত ছিলোনা। কারণ, সে ফাসিক্ব ও ফাজির (জঘন্য পাপাচারী) ছিলো। আর তাও আমীর মু'আভিয়ার একটি শর'ঈ মাসআলায় ভুল বুঝাবুঝির কারণে ছিলো। শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে আমীর মু'আভিয়া মুসলমানদের আমীর (শাসক) হওয়ার উপযোগী ছিলেন। কেননা, তিনি একাধারে রসূলে করীমের সাহাবী, মুত্তাক্বী, ন্যায়পরাপয়ণ ও বিজ্ঞ ছিলেন। আর ইয়াযীদের বিরোধিতা করতে ইমাম হোসাঈন শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে বাধ্য ছিলেন। ইমাম হোসাঈনের মতো ব্যক্তিত্ব ইয়াযীদকে সমর্থন করলে তার সব জঘন্য ও অবৈধ কাজের প্রতিও তাঁর সমর্থন অনিবার্য হতো, যা কখনো বৈধ ছিলোনা, ইসলামের সত্যতা ও ন্যায়পরায়ণতা হুমকির সম্মুখীন হয়ে যেতো।

উদাহরণস্বরূপ, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইগণ আর আরো আগে হযরত আদম আলায়হিস্ সালাম-এর পুত্র ক্বাবীল আপন ভাইকে জ্বালাতন করেছিলো, পিতার মনে কষ্ট দিয়েছিলো। কিন্তু হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইগণ আল্লাহর নবী হযরত ইয়াক্বূব আলায়হিস্ সালাম-এর নৈকট্য পাবার জন্য হযরত ইয়ূসুফকে কষ্ট দিয়েছিলেন। তাদের ধারণা ছিলো যে, হযরত

ইয়ূসুফ না থাকলে তাঁরা পিতার স্নেহ পাবার ক্ষেত্রে হযরত ইয়ূসুফের স্থান লাভ করতে পারবেন। আর ক্বাবীল তো তার জৈবিক চাহিদা পূরণের জন্য, অবৈধভাবে নিজের সহোদরা একৃলীমাকে বিবাহ্ করার ইচ্ছা পোষণ করে ব্যর্থ হয় এবং এ আক্রোশের বশবর্তী হয়ে হাবীলকে হত্যা করেছিলো। ঘটনা দু'টি বাহ্যিকভাবে একই ধরনের হলেও তাদের উভয় পক্ষের নিয়্যতের মধ্যে পার্থক্য ছিলো। এ কারণে, হযরত ইয়ূসুফের ভাইগণ ক্ষমা পেয়ে গেলেন আর ক্বাবীল মারদূদ বা ধিক্কৃত হয়ে গেলো। আমীর মু'আভিয়া ও ইয়াযীদের মধ্যে পার্থক্য এবং সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

আপত্তি-৯.

যেহেতু কোন সাহাবীকে সাহাবী হিসেবে আখ্যায়িত করার জন্য পূর্বশর্ত হচ্ছে তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ঈমানের উপর অটল থাকা, সেহেতু হযরত আমীর মু'আভিয়াকে সাহাবী বলা যাবে না। কারণ, তিনি আহলে বায়তের প্রতি অবজ্ঞা ও শত্রুতা পোষণের কারণে মুরতাদ্দ্ হয়ে গিয়েছিলেন। (না'ঊযুবিল্লাহ্) এ কারণে তাঁকে মুত্তাক্বী, ন্যায়পরায়ণ ও বিজ্ঞ- কোনটাই বলা যাবে না। কারণ, এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য সাহাবা-ই কেরামেরই। অনুরূপ, সাহাবা-ই কেরামের শানে নাযিলকৃত ও বর্ণিত আয়াত এবং হাদীসসমূহও আমীর মু'আভিয়ার বেলায় প্রযোজ্য হতে পারেনা। (সুম্মা না'ঊযুবিল্লাহ্)

খন্ডন

হে আপত্তিকারীরা!, তোমরা আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ঈমানকে অস্বীকার করে নিজেরাই ঈমানহারা হয়ে গিয়েছো। শরীয়তের বিধান হচ্ছে- মুরতাদ্দ্কে হত্যা করা (মৃত্যুদন্ড দেওয়া)। আর যদি মুরতাদ্দ্ প্রভাবশালী হয়, তবে তাকে কতল করার পূর্ব পর্যন্ত তার সাথে যুদ্ধ করা। তাছাড়া, মুরতাদ্দের সম্পদ 'মালে গণীমত' হিসেবে বিবেচ্য। কয়েদকৃত মুরতাদ্দের পরিবার-পরিজনকে গোলাম-বাঁদী বানানো যায়। মুরতাদ্দের নিকট থেকে জিযিয়া গ্রহণ করা হয় না, তার সাথে সন্ধিও হতে পারে না, তার হাতে বায়'আতও গ্রহণ করা যাবেনা। ভন্ডনবী মুসায়লামা কায্যাব হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র দরবারে আরয করেছিলো, "আপনি যদি আপনার পর আমাকে আপনার খলীফা নিয়োগ করেন, তাহলে আমি নুবূয়তের দাবী ছেড়ে দেবো।" তার জবাবে হুযূর-ই আক্রাম বলেছিলেন, "তুমি যদি আমার নিকট এ

কাঁচা মিসওয়াকটিও চাও, তবে আমি তোমাকে তাও দেবোনা।" হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যাকাত প্রদানে অস্বীকারকারীদের দমন করার জন্য নির্দ্বিধায় সৈন্য প্রেরণ করেছিলেন। যখন তারা কোন প্রতিরোধ ছাড়াই তাৎক্ষণিকভাবে আত্মসমর্পণ করে তাওবা করে নিয়েছিলো, তখন তিনি তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছিলেন। তিনি ভন্ডনবী মুসায়লামা কায্যাবকে দমন করার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। তার সাথে তুমুল যুদ্ধও হয়েছিলো। অনেক মুসলমান শহীদও হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুসায়লামাকেও হত্যা করে মুসলমানগণ যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। মুসায়লামার ধন-সম্পাদ 'মালে গণীমত' হিসেবে বন্টন করা হয়েছিলো। কয়েদীদের গোলাম-বাঁদী করে নেওয়া হয়েছিলো। উল্লেখ্য, কয়েদীদের মধ্য থেকে খাওলাহ্ বিনতে জা'ফর হানাফিয়্যাহ্কে হযরত আলী মুরতাদ্বার বাঁদী বানিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, যাঁর গর্ভে মুহাম্মদ ইবনে হানাফিয়্যাহ্ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব এসব মুরতাদের সাথে আপোষ করার কল্পনাটুকুও করেননি। পবিত্র ক্বোরআনে হযরত সিদ্দীক্বে আকবরের এ যুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণী এভাবে করা হয়েছে-

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا (١٦)

তরজমা: ওইসব পেছনে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন, 'অনতিবিলম্বে তোমাদেরকে এক জঘন্য যুদ্ধবাজ সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান করা হবে যে, তাদের সাথে যুদ্ধ করো, অথবা তারা মুসলমান হয়ে যাবে। অতঃপর যদি তোমরা আদেশ মান্য করো, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর যদি ফিরে যাও, যেমন পূর্বে ফিরে গিয়েছিলে, তবে তিনি তোমাদেরকে বেদনাদায়ক শাস্তি দেবেন। [সূরা ফাত্হ: আয়াত: ১৬, কান্যুল ঈমান]

এ আয়াত থেকে কয়েকটা বিষয় প্রতীয়মান হয়ঃ

এক. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের খিলাফত বরহক (সঠিক-সত্য) ছিলো। তাই তাঁর খিলাফতকালে ওইসব মুরতাদ্দের বিরুদ্ধে যুদ্ধও বরহক্ব ছিলো।

দুই. মুরতাদ্দদের থেকে ট্যাক্স (জিযিয়া) লওয়া যাবে না, তাদের সাথে সন্ধিও হতে পারে না। যুদ্ধ অথবা তাদেরকে ইসলামে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

তিন. হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের আনুগত্য করা ফরয। তাঁর বিরোধিতা আল্লাহর কঠিন আযাবের উপযুক্ত হবার কারণ, ইত্যাদি।

লক্ষণীয় যে, এ আয়াত শরীফ ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের পর নাযিল হয়েছিলো। এ আয়াত নাযিল হবার পর হুযূর-ই আক্রাম শুধু হুনায়নের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন। ওই যুদ্ধে বিরোধিতাকারীদেরকে যুদ্ধে শরীক হবার আহ্বান করা হয়নি। সুতরাং উল্লিখিত আয়াতে ইয়ামামার যুদ্ধের কথাই বলা হয়েছে, যা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের খিলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিলো। আর ওই যুদ্ধে বিপক্ষ দল মুরতাদ্দ ছিলো। এজন্য হুকুম হয়েছিলো- تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ (তারা পুনরায় ইসলামে ফিরে না আসা পর্যন্ত তাদের সাথে যুদ্ধ করো)। আয়াতে সন্ধি কিংবা ট্যাক্স (জিযিয়া)-এর কোন কথাই উল্লেখ করা হয়নি। কেননা, মুরতাদ্দদের সম্পর্কে শরীয়তে হুকুম হলো- কতল অথবা পুনরায় ইসলাম গ্রহণ।

বাকী রইলো হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কথা। তাঁর বিরুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যুদ্ধ করেছিলেন; কিন্তু তাঁকে বন্দী করেননি; বরং নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন আমীর মু'আভিয়ার কোন পলায়নরত সৈন্যের পিছু ধাওয়াও করা না হয়, তাঁর সম্পদও যেন জব্দ করা না হয়, তাঁর পরাজিত সৈন্যদেরকে কয়েদ করা না হয়, তাঁর সাথে খারেজী ও কাফিরদের মতো আচরণ করা না হয়। হযরত হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তো তাঁর সাথে সন্ধি করে খিলাফতের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব পুরোপুরিভাবে ছেড়ে দিয়েছিলেন। আর হযরত আমীর মু'আভিয়া মুসলিম সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র খলীফা (শাসক) হয়ে যান।

তদুপরি, হযরত হাসান, হযরত হোসাঈন এবং আহলে বায়তের সবাই, হুযূর-ই আক্রামের সম্মানিত পবিত্র স্ত্রীগণ আর সকল সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম হযরত আমীর মু'আভিয়াকে সমর্থন করেছিলেন। রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু।

এখন বলুন তো, ওইসব হযরত কি পবিত্র ক্বোরআনের ওই নির্দেশের অস্বীকারকারী ছিলেন? মুসায়লামার সাথে হুযূর-ই আক্রামের আচরণ আর মুসায়লামার অনুসারীদের সাথে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের আচরণের কথা কি ওই সব হযরতের জানা ছিলোনা? সুতরাং বুঝা গেলো যে, সিফ্ফীনের যুদ্ধ ও এ জাতীয় যুদ্ধগুলো ধর্মদ্রোহীতার কারণে ছিলোনা, পারস্পরিক মতপার্থক্যের কারণে ছিলো। (ফিক্বহ শাস্ত্রের পরিভাষায় এটাকে ইজতিহাদী মত-পার্থক্য বলা হয়।)

সুতরাং হে আপত্তিকারীরা, সাহাবা-ই কেরাম, বিশেষত, হযরত আমীর মু'আভিয়ার বেলায় মন্তব্য করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে খুব সতর্ক অবলম্বন করো। অন্যথায় ঈমান পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

আপত্তি-১০.

কেউ কেউ বলেছেন, হাদীস শরীফ দ্বারা হযরত আমীর মু'আভিয়ার কোন ফযীলত প্রমাণিত নয়। যেমন আল্লামা মাজদ শীরাযী বলেছেন, ইমাম বোখারী আলায়হির রাহমাহ্ বলেছেন, ইমাম বোখারী 'মানাক্বিবে সাহাবা' (সাহাবীদের গুণাবলী) শীর্ষক অধ্যায়ে যে কয়েকজনের মানাক্বিব বা গুণাবলীর বর্ণনা করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের বেলায় লিখেছেন فضل فلان (অমুকের ফযীলত); কিন্তু আমীর মু'আভিয়ার বেলায় লিখেছেন ذكر فلان (অমুকের আলোচনা)। এ'তে বুঝা গেলো যে, আমীর মু'আভিয়ার কোন ফযীলত নেই। হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীও একথা বলেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

খন্ডন.

আমি ইতোপূর্বে তিরমিযী শরীফ, মুসনাদে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও অন্যান্য নির্ভরযোগ্য হাদীসগ্রন্থ থেকে আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফযীলত সম্বলিত বিভিন্ন হাদীস বর্ণনা করেছি। শায়খ মাজদ ও শায়খ মুহাক্বক্বিক্বে দেহলভী (ক্বুদ্দিসা সিররুহুমা)'র এ রেওয়ায়তগুলো জানা নাও থাকতে পারে। কোন মুহাদ্দিসের কোন হাদীস জানা না থাকলে এর কারণে কোন হাদীসের অস্তিত্বহীনতা বুঝা যায় না।

দ্বিতীয়ত, ইমাম বোখারী আলায়হির রাহমাহ্ শুধু আমীর মু'আভিয়া নন বরং সাইয়্যেদুনা আসমা ইবনে যায়দ, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে সালাম, হযরত জুবায়র ইবনে মুত্ব'ইম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম প্রমুখ বিশিষ্ট সাহাবীদের প্রশংসনীয় জীবনীর আলোচনা শীর্ষক অধ্যায় নির্ণয় করতে গিয়েও লিখেছেন- بَابُ ذِكْرِ فُلَانٍ (অমুকের আলোচনা শীর্ষক অধ্যায়)।

সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, এটা হলো বিজ্ঞ লেখকদের ভাষা শৈলীর তারতম্য মাত্র, কারো ফযীলতকে অস্বীকার করার জন্য নয়। তাছাড়া, কারো প্রশংসামূলক আলোচনাই তো তাঁর ফযীলতের বর্ণনা।

আপত্তি-১১.

হাদীস শরীফে বর্ণিত, হযরত আম্মার (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)কে বিদ্রোহী দল কতল করবে। হযরত আম্মার তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করবেন; কিন্তু ওই দল হযরত আম্মারকে দোযখের দিকে আহ্বান করবে। ঐতিহাসিক সিফ্‌ফীনের যুদ্ধে হযরত আম্মার হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষে ও সাথে ছিলেন। হযরত আমীর মু'আভিয়ার সৈন্যবাহিনীর হাতে তিনি শহীদ হয়েছিলেন। সুতরাং বুঝা গেলো যে, হযরত আলী ও তাঁর সাথীগণ জান্নাতী। পক্ষান্তরে, আমীর মু'আভিয়া ও তাঁর সাথীগণ দোযখী।

খন্ডন

হাদীস শরীফটিতে এরশাদ হয়েছে যে, হযরত আম্মারকে 'বিদ্রোহীরা' হত্যা করবে। বাস্তবেও তাই ঘটেছে। কারণ, ওই যুদ্ধে হযরত আমীর মু'আভিয়া ও তাঁর সাথীগণ হযরত আলীর মোকাবেলায় বিদ্রোহী ছিলেন। এ হাদীসে তো এ কথা এরশাদ হয়নি যে, সব বিদ্রোহী দোযখী। যেমন, হযরত ত্বালহা ও হযরত যোবায়র প্রমুখও তো হযরত আলীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে উষ্ট্রের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন; অথচ তাঁরাও জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ছিলেন। সুতরাং এখন ওই বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয় করা আবশ্যক। কারণ, সেখানে বিদ্রোহীদের মধ্যে সাচ্চা মুসলমানও ছিলেন, আবার নিছক ভ্রান্ত খারেজীরাও বিদ্রোহী ছিলো। উভয় দলের বিদ্রোহের মধ্যে বিরাট ব্যবধানও বিদ্যমান।

এখানে সঠিক কথা হলো- হযরত আলী ইমামে বরহক্ব ও খলীফা ছিলেন। এটাই আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বা বিশ্বাস। আর যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ভুলবশত: ইমাম-ই বরহক্বের মোকাবেলা করে, সে বা তারাও বিদ্রোহী। তবে আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের ভুলটুকুও ক্ষমা করতে পারেন। আর যারা ইমামে বরহক্বের সত্যতা ও নিষ্ঠা সম্পর্কে জানা সত্ত্বেও তাঁর বিরোধিতা করে কিংবা বিরোধিতাকারীদের সাথে স্বেচ্ছায় যোগ দেয়, তারা তো 'খারেজী' (ধর্মদ্রোহী) আর খারেজী হচ্ছে জাহান্নামী।

হযরত আম্মারের, হযরত আলীর হাক্বক্বানিয়াৎ (সত্যতা) সম্পর্কে পূর্ণ আস্থা ছিলো। তিনি যদি ওই আস্থা থাকা সত্ত্বেও আমীর মু'আভিয়ার সাথে যোগ দিতেন, তাহলে বিদ্রোহী নন; বরং খারেজী হিসেবেই গণ্য হতেন। আর খারেজী হচ্ছে জাহান্নামী।

তাছাড়া, উদাহরণস্বরূপ, হানাফী মাযহাবের অনুসারী যদি কোন ইমামের পেছনে নামায পড়ার সময় সূরা ফাতিহা পড়ে। তাহলে তার নামায শুদ্ধ হয় না, তাকে ওই নামায পুনরায় পড়তে হয়। আর সে যদি শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী হয়; তাহলে তার নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায়। তাকে ওই নামায পুনরায় পড়তে হয় না। পার্থক্য হচ্ছে- হানাফী মাযহাবের অনুসারী লোকটা 'না-জায়েয' জেনে 'সূরা ফাতিহা' পড়েছে। তাই সে অপরাধী হলো, আর শাফে'ঈ মাযহাবের অনুসারী লোকটা তা ওয়াজিব মনে করে সূরা ফাতিহা পড়েছে। তাই তার নামায শুদ্ধ হলো। সমস্ত ইজতিহাদী মাসআলার হুকুম (বিধান) এটাই। যেমন- জঙ্গলে/মরুভূমিতে ক্বেবলার দিক জানা না থাকলে চিন্তা-ভাবনা করে নিজের অধিকাংশ ধারণা মতে নামায পড়লে তার নামায শুদ্ধ হয়ে যায়, যদিও ক্বেবলা হয় অন্য কোন দিকে। আর যদি তখন সে তার ধারণার বিপরীত দিকে মুখ করে নামায পড়ে, তবে তার নামায বাতিল হয়ে যায়; যদিও সে তখন ক্বেবলার সঠিক দিকে ফিরে নামায পড়ে।

সুতরাং আপত্তিকারীর উক্ত আপত্তিও বাতিল বা ভিত্তিহীন।

আপত্তি-১২.

একদা আমীর মু'আভিয়া তাঁর কাঁধে পুত্র ইয়াযীদকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে দেখে বলেছিলেন, "দোযখীর উপর চড়ে দোযখী যাচ্ছে।" এ থেকে বুঝা গেলো যে, আমীর মু'আভিয়াও দোযখী, ইয়াযীদও দোযখী।

খন্ডন

আপত্তিকারীর বর্ণনাটা ডাহা মিথ্যা ও বানোয়াট। আল্লাহ্ ও পরকালের ভয় থাকলে কেউ এহেন মিথ্যা অপবাদ দিতে পারে না। জামে'-ই ইবনে আসীর, কিতাবুন্না-হিয়াহ্ এবং ইতিহাসের গ্রন্থাবলী পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, পাপিষ্ঠ ইয়াযীদ জন্মগ্রহণ করেছিলো হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিলাফতকালে। সুতরাং হুযূর-ই আক্রামের যুগে আমীর মু'আভিয়ার কাঁধে ইয়াযীদ আরোহণ করে যাওয়ার ঘটনা যে জঘন্য মিথ্যাচার, তাতে সন্দেহ কিসের?

এ প্রসঙ্গে আরেকটা মিথ্যাচারের কথাও উল্লেখ করছি। তা হলো- কিছুলোক বলে, হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম মারওয়ান ইবনে হাকামকে মদীনা শরীফ থেকে তায়েফ চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আর হযরত ওসমান গণী তাঁর খিলাফতকালে মারওয়ানকে মদীনা মুনাওয়ারায় ফিরে আসার অনুমতি দিয়ে হুযূর-ই আক্রামের বিরোধিতা করেছিলেন। (না'ঊযুবিল্লাহ্)

এর জবাব, এ ইতিহাসও বানোয়াট এবং মিথ্যা। হযরত ওসমান গণী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মতো শীর্ষস্থানীয় সাহাবীর প্রতি হুযূর-ই আক্রামের তথাকথিত বিরোধিতার কখনো কল্পনাও করা যায়না; এটা তাঁর প্রতি মিথ্যা অপবাদ রটনা বৈ-কিছুই নয়। শিয়া-রাফেযীরাই সাহাবা কেরামের বিরুদ্ধে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে বিষোদ্গার করে থাকে।

প্রকৃত ইতিহাস হচ্ছে- হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর ওফাত শরীফের সময় মারওয়ানের বয়স ছিলো মাত্র চার বছর কয়েকমাস। সে খন্দক্বের যুদ্ধের সময় জন্মগ্রহণ করেছিলো। তাই তাকে বের করে দেওয়ার অর্থই বা কি? আসল ঘটনা হলো- তার পিতা হাকামকে বহিস্কার করা হয়েছিলো। আর মারওয়ান তার সাথে চলে গিয়েছিলো। এ কারণে মারওয়ান সাহাবী ছিলোনা। আর হাকাম হযরত ওসমান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর যুগে তার কৃত ওই অপরাধের জন্য তাওবা করেছিলো, যার কারণে তার বহিষ্কার প্রত্যাহার করা হয়েছিলো। সাচ্চা অন্তরে তাওবার পরতো কাফিরের উপরও মু'মিনের বিধান জারী হয়। সুতরাং আপত্তিকারীদের এ আপত্তিও অকেজো।

আপত্তি-১৩.

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম 'বনূ সাক্বীফ', 'বনূ উমাইয়া' ও 'বনূ হানীফা'-এ তিন গোত্রকে অপছন্দ করতেন। আমীর মু'আভিয়া বনূ উমাইয়া গোত্রের লোক। তাই তিনি হুযূর-ই আক্রামের নিকট অপছন্দনীয় ছিলেন।

খন্ডন

এ আপত্তির দু'টি উত্তর দেওয়া যায়- একটি 'ইলযামী' (আপত্তির বিরুদ্ধে আপত্তি) এবং দ্বিতীয়টি 'তাহ্ক্বীক্বী' বা বিশ্লেষণধর্মী।

'ইলযামী' উত্তর হচ্ছে- হযরত ওসমান গণী ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমাও তো বনূ উমাইয়ার লোক। হে আপত্তিকারীরা! তোমাদের কথা মতো যদি বনূ উমাইয়ার লোক হওয়ার কারণে

হযরত আমীর মু'আভিয়া আল্লাহর রসূলের দরবারে অপছন্দনীয় হন, তবে হযরত ওসামন ও হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা সম্পর্কে কি বলবে? হযরত ওসমান গণী যেমন শীর্ষস্থানীয় সাহাবী ছিলেন, তেমনি তিনি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর দু'টি কন্যাকে পরপর শাদী করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। এ জন্য তাঁকে 'যুন্ নূরাঈন' (দু'টি নূরের অধিকারী) বলা হয়। আর হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয তো তাবে'ঈ ছিলেন। তাঁকে পঞ্চম 'খলীফা-ই রাশেদ' বলা হয়। তাঁর শান-মান ও উচ্চ মর্যাদা গোটা মুসলিম সমাজে স্বীকৃত। আল্লাহ্-রসূলের মহান দরবারে তাঁরা পছন্দনীয় ছিলেন বলেই তো তাঁদের এ উচু মর্যাদা। তাতে সন্দেহ কিসের?

বিশ্লেষণধর্মী জবাব হলো- কোন গোত্র কিংবা কোন শহর বা নগর অপছন্দনীয় হবার এ অর্থ নয় যে, ওই গোত্র বা নগরীর প্রতিটি ব্যক্তিও অপছন্দনীয়। এভাবে কোন গোত্র বা নগরী পছন্দনীয় হবারও এ অর্থ নয় যে, ওই গোত্র বা নগরীর প্রত্যেক ব্যক্তি বা বস্তু পছন্দনীয়। হুযূর-ই আক্বরামের নিকট মক্কা মুকাররামাহ্ প্রিয় ছিলো। কিন্তু এর এ অর্থ নয় যে, সেখানকার আবূ লাহাব ও আবূ জাহলের মতো কট্টর কাফিররাও হুযূর-ই আক্বরামের নিকট পছন্দনীয় ছিলো। মদীনা মুনাওয়ারাও হুযূর-ই আক্বরামের নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলো। এরও এ অর্থ নয় যে, মদীনা মুনাওয়ারার সমস্ত মুনাফিক্ব, আবদুল্লাহ্ ইবনে উবাই ইবনে সুলূল প্রমুখও তাঁর নিকট পছন্দনীয় ও প্রিয় ছিলো; বরং এরা হুযূর-ই আক্বরামের নিকট অপছন্দনীয় ছিলো। তিনি নজদের জন্য দো'আ করেননি। এর অর্থ এ নয় যে, সেখানকার নিষ্ঠাবান মুসলমানগণও অভিশপ্ত ছিলেন।

যেহেতু ওই তিন গোত্রের মধ্যে কয়েকজন বড় ফিৎনাবাজ জন্মগ্রহণ করেছিলো, সেহেতু ওই গোত্রগুলো 'অপছন্দনীয়' খেতাবটা লাভ করেছিলো। যেমন-বনূ সাক্বীফ (গোত্র)-এ মুখতার ইবনে ওবায়দ ও হাজ্জাজ ইবনে ইয়ূসুফের মতো যালিমের জন্ম হয়েছিলো। বনূ হানীফায় মুসায়লামা কায্যাব ও তার অনুসারী মুরতাদ্দদের আভির্ভাব হয়েছিলো। আর বনূ উমাইয়া গোত্রে কুখ্যাত ফাসিক্ব, যালিম ও পাপিষ্ট ইয়াযীদ ও ইবনে যিয়াদের মতো লোক জন্মগ্রহণ করেছিলো। উপরোক্ত অভিশপ্ত ও ধিক্কৃত লোকেরা ওই তিন গোত্রের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেছিলো বিধায় গোত্রগুলোকে হুযূর-ই আক্রাম অপছন্দ করতেন। একথার সমর্থন উপরোক্ত হাদীসে পাওয়া যায়, যা তিরমিযী শরীফে ওই একই জায়গায়

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত হয়েছে। এ'তে হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ করেছেন, বনূ সাক্বীফে এক মিথ্যুক ও এক যালিম পয়দা হবে। এ ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে, তাতে মিথ্যুক মুখতার ইবনে ওবায়দ এবং যালিম হাজ্জাজ ইবনে ইয়ূসুফের জন্ম হয়েছে।

দেখুন, আজ আমরা খাজা গরীব নাওয়ায আলায়হির রাহমাহ্ ওয়ার রিদ্বওয়ানের কারণে আজমীরকে 'আজমীর শরীফ' বলি। পক্ষান্তরে, কতিপয় বিশ্বাস ঘাতকের কারণে কূফাকে ঘৃণার চোখে দেখি; কিন্তু এর এ অর্থ নয় যে, আজমীর শরীফের হিন্দুরাও 'শরীফ' এবং কূফায় বসবাসকারী হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম, হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম এবং হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও, না'ঊযুবিল্লাহ্, ঘৃণার পাত্র!

সুতরাং বনূ উমাইয়ার হওয়ার কারণে হযরত আমীর মু'আভিয়াকে হুযূর-ই আক্রামের নিকট অপছন্দনীয় বলা একেবারে ভিত্তিহীন। হযরত আমীর মু'আভিয়া হুযূর-ই আক্রামের নিকট পছন্দনীয় হবার বহু অকাট্য প্রমাণ বিদ্যমান।

আপত্তি-১৪.

হাদীস শরীফে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, "আমার পর ত্রিশ বছর 'খিলাফত' বলবৎ থাকবে। তারপর রাজতন্ত্র আরম্ভ হবে।" [তিরমিযী, আহমদ ও আবূ দা'ঊদ]

এ ত্রিশ বছর ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে পূর্ণ হয়। তা এভাবে যে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব-এর খিলাফত প্রায় দু' বছর, হযরত ওমর ফারূক্বের দশ বছর, হযরত ওসমান গনীর বার বছর, হযরত আলীর প্রায় ছয় বছর আর অবশিষ্ট ছয়মাস ইমাম হাসান পূর্ণ করেছেন। এতে বুঝা যায় যে, আমীর মু'আভিয়ার খিলাফত বরহক্ব (বৈধ) নয়।

খন্ডন

'খিলাফত' বলতে কখনো 'খোলাফা-ই রাশেদীন'-এর শাসনামল বুঝায়, আবার কখনো সাধারণ অর্থে রাজত্ব বা হুকুমত বুঝায়। সুতরাং 'খলীফা' শব্দটিও এ দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়। উপরোক্ত হাদীস শরীফে 'খিলাফত' বলতে 'খোলাফা-ই রাশেদীনের খিলাফত' বুঝানো হয়েছে। আহলে সুন্নাতের আক্বীদা বা বিশ্বাস হচ্ছে- 'খোলাফা-ই রাশেদীন'-এর যুগ ছিলো ত্রিশ বছর, যা ইমাম হাসান

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ছয়মাস খিলাফতের মাধ্যমে পূর্ণ হয়। অতঃপর আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলামের প্রথম সুলতান বা বাদশাহ্ হন। আর ক্বিয়ামত পর্যন্ত তিনি 'সুলতান' (বা রাষ্ট্রপ্রধান) হিসেবে আখ্যায়িত হবেন, 'খলীফা-ই রাশেদ' নামে আখ্যায়িত হবেন না।

অন্য অর্থে, ইসলামী সুলতানকে 'খলীফা'ও বলা যায়। যেমন হাদীস শরীফে বর্ণিত, বার (বা দ্বাদশ) খলীফা পর্যন্ত ইসলাম প্রিয় থাকবে।

সুতরাং আপত্তিকারীদের উক্ত আপত্তি তখনই সঠিক হতো, যদি আমরা আমীর মু'আভিযাকে 'খলীফা-ই রাশেদ' (খোলাফা-ই রাশেদীন-এর অন্তর্ভুক্ত) বলতাম। আমরা তো ইসলামী পরিভাষা অনুসারে তাঁকে আখ্যায়িত করি। আর উপস্থাপিত হাদীস শরীফে ত্রিশ বছর পরে ইসলামী রাষ্ট্র যে নিয়মে পরিচালিত হবে বলে হুযূর-ই আক্রাম ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন হযরত আমীর মু'আভিয়ার মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়েছে। আর যেহেতু আমীর মু'আভিয়া ব্যক্তিগতভাবে ন্যায়পরায়ণ, অসাধারণ খোদাভীরু শাসক ছিলেন, সেহেতু তাঁর রাজত্বকালকে বরহক্ব ছিলোনা বলাও ঠিক হবে না। কারণ, ইসলামে তো রাজতন্ত্র হারাম বা নিষিদ্ধ নয়; ইসলামে রাষ্ট্র পরিচালনায় ন্যায়পরায়নতা ও খোদাভীরুতাই মুখ্য। সুতরাং এ আপত্তিও ভিত্তিহীন।

আপত্তি-১৫.

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, "তোমরা আমার মিম্বরের উপর মু'আভিয়াকে দেখা মাত্র হত্যা করে ফেলবে। এ হাদীস ইমাম যাহাবী উদ্ধৃত করেছেন এবং বিশুদ্ধ বলেছেন। এ'তে বুঝা গেলো যে, আমীর মু'আভিয়া হত্যার উপযোগী ছিলেন।

খন্ডন

হাদীসটাও মিথ্যা এবং বানোয়াট। আর ইমাম যাহাবীর বরাতও মিথ্যা এবং অপবাদের সামিল। 'মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর লা'নত অবধারিত।' হাদীস শরীফে বর্ণিত, আল্লাহর রসূলের নামে মিথ্যা রচনা করা দুনিয়ায় থাকতে জাহান্নামে ঠিকানা করে নেওয়ার নামান্তর।

আর ইমাম যাহাবী এ জাল হাদীস তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে উল্লেখ করলেও তিনি সাথে সাথে লিখে দিয়েছেন যে, "হাদীসটি মাওদ্বূ' বা বানোয়াট। এর কোন ভিত্তি নেই।"

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়ও যে, হুযূর-ই আক্রাম আমীর মু'আভিয়া সম্পর্কে এটা বলার কি প্রয়োজন ছিলো? তিনি নিজেও তো হত্যা করাতে পারতেন। তিনি তা তো করেননি, বরং 'ওহী লিখক'-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ খিদমতে তাঁকে অধিষ্ঠিত করেছিলেন। তাছাড়া, সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন ও আহলে বায়তে কেরাম হাদীসটি শুনে কি সেদিকে ভ্রুক্ষেপই করেননি? বরং হযরত ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তো আমীর মু'আভিয়ার পক্ষে খিলাফত ছেড়ে দিয়ে হযরত আমীর মু'আভিয়ার জন্য রসূলে আক্রামের মিম্বর শরীফকে খালিই করে দিয়েছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা আমীর মু'আভিয়ার ইলম ও আমলের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তাঁকে 'দ্বীনের মুজতাহিদ' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁদের কারো নিকট কি হাদীসটি পৌঁছলোনা, এত শতাব্দি পর ওই আপত্তিকারীদের নিকট পৌঁছে গেলো? মিথ্যা রটনা ও অপবাদের সীমা ছাড়িয়ে যে তারা দোযখের দিকে কতদূর এগিয়ে গেলো তা বলার অপেক্ষা রাখেনা।

ইদানিং চট্টগ্রামের জমিয়তুল ফালাহ্ জামে মসজিদে আয়োজিত 'শাহাদাতে কারবালা' মাহফিলে আমন্ত্রিত এক ভ্রান্ত মতবাদ পোষণকারী, শিয়াপন্থী বক্তা *এভাবে আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শানে এক জঘন্য ও বানোয়াট কথা রচনা করে উপস্থাপন করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছিলো। সে জঘন্য ও ডাহা মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হযরত আমীর মু'আভিয়ার পূত:পবিত্র স্বচ্ছ চরিত্রে দাগ লাগতে চেয়েছিলো। পরবর্তীতে অবশ্য তাঁর যথোপযুক্ত খন্ডন করে তার লাহাবী মুখমন্ডল থেকে কৃষ্ণ ও কুৎসিৎ মুখোশটি অপসারণ করে তাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আর এ ধরনের মাহফিলে নির্বিচারে বক্তাদের দাওয়াত দিয়ে তাদের মাধ্যমে এ বিশাল সুন্নী অঙ্গনে বিভ্রান্ত ছড়ানোর সুযোগ বন্ধেরও জোর দাবী উত্থাপন করা ও পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।*

পরিশেষে, এ প্রসঙ্গে সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসকে অটুট রাখার এবং নানা ধরনের বিভ্রান্তি থেকে ঈমানকে হেফাযত করার উপায় হিসেবে হাকীমুল উম্মত হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কয়েকটা উপকারী পরামর্শ দিয়েছেন। পরামর্শগুলো নিম্নে উল্লেখ করার প্রয়াস পাচ্ছি-

পরামর্শ-১.

ঈমানের জন্য পবিত্র আহলে বায়তের ভালবাসা ও সাহাবা-ই কেরামের অনুসরণ তেমনি প্রয়োজন, যেমন পাখীর জন্য দু'টি ডানা।

যদি এ দু'টির কোন একটা থেকে কেউ বঞ্চিত হয়, সে ঈমান হারা হয়ে যায়। হুযূর-ই আক্রাম এরশাদ ফরমান, "আমার সাহাবীগণ উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। তোমরা তাদের মধ্যে যাঁরই অনুসরণ করবে, হিদায়ত পেয়ে যাবে।" তিনি আরো এরশাদ ফরমায়েছেন, "আমার আহলে বায়ত হযরত নূহ আলায়হিস্ সালাম-এর কিস্তীর মতো। যে তাতে আরোহণ করলো, সে নাজাত (মুক্তি) পেয়ে গেলো, আর যে তা থেকে বিরত রইলো, সে ডুবে গেলো।" সামুদ্রিক সফরের জন্য যেমন জাহাজের দিক-নির্দেশক হিসেবে নক্ষত্রের প্রয়োজন, তেমনি পরকালের সফরের জন্য 'আহলে বায়তের কিস্তি ও নক্ষত্রস্বরূপ সাহাবা-ই কেরামের প্রয়োজন। এ জন্য আহলে সুন্নাত দুনিয়া ও আখিরাতে নিরাপদ ও সফলকাম। কারণ, তাঁরা আহলে বায়তের কিস্তির আরোহী আর সাহাবা-ই কেরামের প্রকৃত অনুসারী।

পরামর্শ-২.

আহলে বায়তের ভালবাসা ও সম্মানিত সাহাবীদের অনুসরণ মানে হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সকল আহলে বায়তকে ভালবাসা এবং সকল সাহাবা-ই কেরামের প্রতি আস্থাশীল হওয়া। এ দু' পবিত্র জামা'আতের মধ্যে কোন একজনের প্রতি শত্রুতা পোষণ করা পরোক্ষভাবে সবার প্রতি শত্রুতা পোষণ করার নামান্তর। যেমন, সকল পয়গাম্বর আলায়হিমুস্ সালাম-এর উপর ঈমান আনা ফরয; তাঁদের মধ্যে কাউকে অস্বীকার করা মানে সকলকে অস্বীকার করার সামিল। মু'মিন হওয়ার জন্য সবাইকে মান্য করা আবশ্যকীয়। অনুরূপ, ঈমানের জন্য হুযূর-ই আক্রামের সকল সাহাবী ও আহলে বায়তের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা জরুরী। যদি কেউ বলে, আমি আহলে বায়তের মধ্যে হুযূর-ই আক্রামের চার সাহেবযাদী থেকে শুধু এক সাহেবযাদী হযরত ফাতিমা যাহরাকে, হুযূর-ই আক্রামের নয় পবিত্র স্ত্রীর মধ্যে কেবল এক স্ত্রী হযরত খাদীজাতুল কুবরাকে, হুযূর-ই আক্রামের জামাতাগণের মধ্যে শুধু হযরত আলীকে, এক লক্ষ চব্বিশ হাজার সাহাবীর মধ্যে কেবল পাঁচ কিংবা ছয়জন সাহাবীকে মানি ও শ্রদ্ধা করি, বাকী সবাইকে ঘৃণা করি; (না'উযুবিল্লাহ), সে

মূলতঃ হুযূর-ই আক্রামকে মান্য করে না। আর যারা কেবল বারজন'কে মানে, কেউ শুধু ছয়জনকে মানে, কেউ শুধু তিনজনকে মানে, তাদের এ গণনা ও সংখ্যা নির্ণয় মনগড়া, তাদের চরম ভ্রান্তির পরিচায়ক। বস্তুতঃ যাঁরা ঈমানের সাথে জামালে মুস্তফাকে একবারও দেখেছেন, তাঁরা সকলে আমাদের নয়নমণি, আমাদের কলিজার টুক্রা।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আক্বীদা হচ্ছে- পবিত্র আহলে বায়ত ও সাহাবা-ই কেরাম তো আছেন, মদীনা মুনাওয়ারার ধুলিবালিও ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের মহৌষধ এবং অশান্ত মনের শান্ত্বনা। আমাদের নিকট হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্র জুতো মুবারক যেমন মাথার মুকুট, তেমনি হযরত ফাত্বিমা যাহরার পায়ের নিচের পবিত্র মাটিও চোখের সুরমা সমতুল্য। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব-ই আক্বার যেমন মুসলমানদের মাথার মুকুট ও প্রথম খলীফা, তেমনি হযরত আলী মুরতাদ্বা খোলাফা-ই রাশেদীনের একজন ও ওলীগণের মধ্যে বেলায়ত বন্টনকারী। হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি সত্যিকারের ভালবাসার অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি বা জিনিষ ওই পবিত্র সত্তা (হুযূর-ই আকরাম)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেটার প্রতি যেন আমরা ভালবাসা পোষণ করি ও শ্রদ্ধাশীল হই। মজনূর নিকট লায়লার গলির কুকুরও প্রিয় ছিলো। আর মু'মিনের নিকট হুযূর-ই আক্রামের নগরীর গলির কাঁটাও প্রিয়।

মু'মিনের কাছে ওই তথাকথিত তালিকার কোন গুরুত্ব নেই। কবির ভাষায়-

عاشقاں را چہ کار با تحقیق- ہر جا نام اوست قربانم

অর্থ: গবেষণা-বিশ্লেষণের সাথে আশিক্বদের কি কাজ? যেখানেই মা'শূক্বের নাম আছে, ওখানেই আমি উৎসর্গীকৃত বা ক্বোরবান।

পরামর্শ-৩.

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে কোন কোন সাহাবী থেকে যা কিছু প্রকাশ পেয়েছে, অথবা ইসলাম গ্রহণের পরও কোন ভুল-ত্রুটি সংঘটিত হয়ে থাকলে আল্লাহ্ তা'আলা সবকিছুর ক্ষমার ঘোষণা দিয়েছেন। এখন সমালোচনার কুমৎলবে ওইসব নিয়ে ঘাটাঘাটি করা ঈমানের পরিপন্থী। যেমন হযরত আবূ সুফিয়ান রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ঈমান আনার আগে হুযূর-ই আক্রামের সাথে অনেক যুদ্ধ করেছেন, ওয়াহ্শী ঈমান আমার আগে হযরত হামযাকে শহীদ করেছেন, হযরত আবূ সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা হযরত আমীর হামযার লাশের প্রতি অমানবিক আচরণ

করেছিলেন; কিন্তু পরে তাঁরা সবাই মুসলমান হয়ে গেছেন। খোদ্ নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম তাঁদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাঁদেরকে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছেন। সুতরাং আমরা কি জিনিষ? আপন চাচার প্রতি কি হুযূর-ই আক্রাম অপেক্ষা আমাদের দরদ বেশী? কোন কোন নবী আলায়হিস্ সালাম থেকে বাহ্যিকভাবে ত্রুটি বিচ্যুতি সংঘটিত হয়েছে বলে মনে হবে। নবীর সাহেবযাদাদের থেকেও কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে। যেমন হযরত ইয়াক্বূব আলায়হিস্ সালাম-এর সন্তানগণ থেকে তাঁরই প্রিয় পুত্র হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি নির্যাতন সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু ক্বোরআন-হাদীসে নবীগণের নিষ্পাপ হওয়া এবং শেষোক্তদের মার্জ্জনার ঘোষণা এসেছে। এখন আমাদের কি অধিকার আছে ওইসব মহান ব্যক্তির অশোভন সমালোচনার নিয়্যতে আলোচনা করার? এমনটি করা মানে নিজেদের ঈমানের সর্বনাশ করা। আমাদের দৃষ্টি তাঁদের ভুল-ত্রুটির প্রতি নয় বরং তাঁদের সম্পর্কের প্রতি নিবদ্ধ থাকা চাই। আমরা যেন এটা না দেখি যে, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর প্রতি তাঁর ভাইগণ কী করেছেন? হযরত যুলায়খা হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে কিরূপ আচরণ করেছিলেন? হযরত আবূ সুফিয়ান, হযরত ওয়াহশী, হযরত আমীর মু'আভিয়া (কোন কোন ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে) কি কি করেছেন? বরং আমাদের দেখা উচিৎ হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর ভাইগণ একজন নবীর পুত্র, সন্তান ও নবীর ভাই, হযরত যুলায়খা একজন নবীর স্ত্রী, হযরত আবূ সুফিয়ান, হযরত হিন্দা, হযরত ওয়াহ্শী ও হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম হলেন সাইয়্যেদুল মুরসালীন সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সাহাবা-ই কেরাম। সাহাবীগণ হলেন উম্মতের ওলী ও আলিমের চেয়েও বহুগুণ বেশী উত্তম, সমস্ত উত্তম সরদার ও অনুকরণীয়।

পরামর্শ-৪.

হযরাত সাহাবা-ই কেরামের পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদের কথা আলোচনা না করাই শ্রেয়। আলোচনার একান্ত প্রয়োজন হলে সবাইকে উত্তম বলতে হবে। তাঁরা যে সবাই ভাল ও ন্যায়পরায়ণ ছিলেন, সে কথার সাক্ষ্য স্বয়ং ক্বোরআন শরীফ দিয়েছে। আমাদের জ্ঞান আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল অপেক্ষা বেশী নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদেরকে ঈমানদার ও জান্নাতী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন।

আমাদের বাপ-চাচার মধ্যেও যদি ঝগড়া-বিবাদ হয়, তবে আমাদের উচিৎ তাঁদের মধ্যে কারো পক্ষ অবলম্বন না করা; বরং তাঁদেরকে পূর্বের ন্যায় সম্মান করে যাওয়া। কারণ, তাঁরা আজ না হলে কাল পরস্পর মিলে যেতে পারেন। আর আমরা যদি তাঁদের মধ্যে কারো প্রতি বেয়াদবী করি, তবে উভয় দিক হারাবো। হযরত আলী মুরতাদ্বা ও হযরত আমীর মু'আভিয়া উভয়ে জান্নাতে ভাই ভাই হয়ে থাকবেন। আর আমরা যদি তাঁদের কাউকে মন্দ বলি, তবে আমরা অপরাধী বা গুনাহ্গার থেকে যাবো। ঈমানের চূড়ান্ত ফয়সালা হচ্ছে- হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পক্ষে রায়, আর আমীর মু'আভিয়ার ইজতিহাদী ত্রুটি-বিচ্যুতির ক্ষমাপ্রাপ্তি। এটার উপর আহলে সুন্নাতের ঐকমত্য রয়েছে।

পরামর্শ-৫.

নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বংশধর অর্থাৎ সাইয়্যেদগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। কারণ, তাঁরা ওই নবীর আওলাদ, যাঁর নিকট থেকে আমরা কলেমা পেয়েছি, ঈমান পেয়েছি, ক্বোরআন পেয়েছি। আমরা কখনো তাঁর এসব করুণা ও বদান্যতার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না। তাঁর সাইয়্যেদুল মুরসালীন-এর আওলাদ। আল্লাহ্ তা'আলা নেক পিতা-পিতামহদের খাতিরে সন্তানদের উপর দয়া করবেন। ক্বোরআনে করীমে এরশাদ ফরমান- وَكَانَ اَبُوْهُمَا صَالِحًا (এবং এ দু' এতিমের পিতা একজন নেক্কার ছিলো। [সূরা ক্বাহ্ফ: আয়াত-৮২] দেখুন, আল্লাহ্ তা'আলা ওই দু' এতিমের সম্পদ হযরত খাদ্বির আলায়হিস্ সালাম-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ করেছেন। এর কারণ ছিলো- তাদের পিতা নেক্কার-সৎকর্মপরায়ণ ছিলেন। সাইয়্যেদদের উপর যাকাত এবং ওয়াজিব সাদক্বাহ্ হারাম। এটাও তাঁদের সম্মানের কারণে। কারণ, যাকাত হচ্ছে- ধনীদের সম্পদের ময়লা-আবর্জ্জনা। কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের সবাই গোমরাহ্ বা পথভ্রষ্ট হতে পারে; কিন্তু সমস্ত সাইয়্যেদ গোমরাহ্ হতে পারেন না। কারণ, তাঁরা হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম-এর বংশধর। তাঁদের জন্য খোদ্ হযরত ইব্রাহীম আলায়হিস্ সালাম দো'আ করেছেন- وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ (তরজমা: এবং আমাদের বংশধরদের মধ্য থেকে একটা উম্মতকে তোমারই অনুগত করো। [সূত্র. বাক্বারা: আয়াত-১২৮]

ঈমাম মাহদী সাইয়্যেদ বংশীয় হবেন। তাঁর পেছনে হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালামও নামায পড়বেন। তিনি পৃথিবীতে ন্যায়নীতি ও ইনসাফ কায়েম করবেন। ওই সাইয়্যেদগণের প্রতি আমরা প্রতি নামাযে দুরূদ পাঠ করি- আল্লা-হুম্মা সল্লি 'আলা সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন ওয়া 'আলা আ-লি সাইয়্যেদিনা মুহাম্মাদিন'। বিশ্বখ্যাত কিতাব 'সাওয়া-'ইক্বি মুহরিক্বাহ্'য় বর্ণিত, "বাহ্যিক খিলাফত যদিওবা আহলে বায়তের হাতছাড়া হয়ে গেছে, কিন্তু বাত্বেনী খিলাফত ক্বিয়ামত পর্যন্ত যুগে যুগে 'ক্বুতবুল আক্বতাব'-এর পবিত্র হাতে থাকবে। আর 'ক্বুত্ববুল আক্বতাব' হবেন সাইয়্যেদগণ থেকে।" ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি বলেছেন, "সাইয়্যেদগণ আল্লাহ্ তা'আলার মজবুত রশি।" মোটকথা, সাইয়্যেদগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন হচ্ছে প্রকৃত ঈমানের দাবী। এমনকি, কোন সাইয়্যেদ থেকে কোন গুনাহ্ সম্পন্ন হয়ে গেলে তখন যেন আমরা গুনাহ্কেই মন্দ জ্ঞান করি; সাইয়্যেদকে না। যদি কোন বিচারকের সামনে কোন সাইয়্যেদকে এমন কোন অপরাধের জন্য হাযির করা হয়, যার জন্য শরীয়তসম্মত শাস্তি অপরিহার্য হয়ে যায়, তা হলে বিচারক যেন এরূপ মনে না করে যে, "সাইয়্যেদ সাহেবের পায়ে কাদা লেগেছে, আমি সেটা পরিস্কার করছি।" মোটকথা, সাইয়্যেদগণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা একান্ত প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে আরো বিস্তারিত জানতে হলে মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি কর্তৃক লিখিত 'আলকালামুল মাক্ববূল' পাঠ-পর্যালোচনা করুন।

পরামর্শ-৬.

'সাইয়্যেদ' বলতেই দাদার দিক দিয়ে তাঁদের বংশীয় পরম্পরা ইমাম হাসান ও হযরত আলীর সাথে মিলে যায়; আর নানার দিক দিয়ে তাঁদের বংশীয় পরম্পরা হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের সাথে মিলে যায়। কেননা ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাতা মুহতারিমাহ্ হলেন ফারদা বিনতে ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক্ব। [সূত্র. সাওয়া-'ইক্বে মুহরিক্বাহ্, পৃ. ১০০]

কেউ ইমাম জা'ফর সাদিক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে জিজ্ঞাসা করেছিলো, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব কেমন? তদুত্তরে তিনি বলেছিলেন, "হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব আমার নানা। আমি তাঁর প্রশংসা ব্যতীত অন্য কিছু বলতে পারি না। যে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ্ তাকে নবী

করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সুপারিশ নসীব করবেন না।" [সাওয়া-ইক্বে মুহরিক্বাহ্, পৃ. ৩২]

সুতরাং সাইয়্যেদগণের পিতৃ ও মাতৃগোষ্ঠীকে সম্মান করা একান্ত অপরিহার্য। ইমাম জা'ফর সাদিক্বের পিতৃ ও মাতৃ বংশের শাজরা দেখুন, ইমাম জাফর সাদিক্ব ইবনে ইমাম যায়নুল আবেদীন ইবনে ইমাম হোসাঈন ইবনে হযরত আলী মুরতাদ্বা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম।

ইমাম জা'ফর সাদিক্ব ইবনে ফারদা বিনতে ক্বাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম। সুতরাং তিনি হযরত আলীর ৪র্থ পৌত্র এবং হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বের ৪র্থ দৌহিত্র। এ বিষয় স্মরণ রাখা অতীব প্রয়োজন।

পরামর্শ-৭.

কারো পক্ষে এভাবে বলা ঠিক হবে না, "আমরা সাইয়্যেদ, হুযূর-ই আক্রামের বংশধর, আর তোমরা হলে হুযূর-ই আক্রামের উম্মত। তোমাদের নেক আমল করা প্রয়োজন। আমাদের এ সবের প্রয়োজন নেই।" এমনটি বলা খুবই মন্দ। কারণ, এর মাধ্যমে তারা যেন নিজেদেরকে হুযূর-ই আক্রামের উম্মত বলতে অস্বীকৃতি জানালো। মু'মিন মুসলমানগণ সবাই হুযূর-ই আক্রামের 'উম্মতে ইজাবত'। অর্থাৎ হুযূর-ই আক্রামের 'দা'ওয়াত' কবূল করেছেন এমন। আর অন্যান্যরা হলো উম্মতে দা'ওয়াত। সুতরাং কেউ হুযূর-ই আন্ওয়ারের উম্মত হতে অস্বীকার করলে সে তো নিজেকে কাফির বলে স্বীকার করলো। সাহাবা-ই কেরাম, হুযূর-ই আকরামের আহলে বায়ত (পরিবার-পরিজন), এমনকি হুযূর-ই আন্ওয়ারের পিতা-মাতাও তাঁর উম্মত। হুযূর-ই আক্রামের উম্মত হওয়া অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। এটা অস্বীকার করা হয়তো অজ্ঞতা, নতুবা চরম গোমরাহী, যা তাকে ঈমানের গন্ডি থেকে বের করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, কোন মুসলমান মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত আমল করা থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। নিষ্পাপ নবী ও রসূলগণের সরদার আমাদের আক্বা ও মাওলা হুযূর-ই আক্রাম নিজেকে কখনো আমল থেকে বিরত রাখেন নি। হযরত আলী, হযরত ফাতিমা যাহরা, হযরত হাসান ও হযরত হোসাঈন আমলের পাবন্দ ছিলেন। সরকার-ই দু' জাহান সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম নিজের স্নেহের কন্যা হযরত ফাতিমা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহার উদ্দেশে এরশাদ

করেছেন, "এমন যেন না হয় যে, ক্বিয়ামতের দিন সবাই আমল নিয়ে উঠবে আর তোমরা উঠবে শুধু বংশ-গৌরব নিয়ে।" হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শাহাদতের সময়ও নামায পড়েছেন। সাজদারত অবস্থায় নিজের মস্তক মুবারক দিয়েছেন। তাঁদের থেকে বড় এমন কে আছে, যার আমলের প্রয়োজন নেই? আসলে নবীর বংশধরদের আমল বেশী হওয়া চাই, যাতে তাঁরা তাঁদের পূর্বরুষদের নমুনা হন। তাঁদের আমল দেখে যেন দুনিয়াবাসী একথা বলতে বাধ্য হয় যে, নবীর বংশধরদের যদি এত বেশী আমল হয়, তবে তাঁদের পূর্বপুরুষদের আমল কত বেশী হবে!

উদাহরণস্বরূপ, রেলের সকল শ্রেণীর যাত্রীর রেলের ইঞ্জিনের সাথে সংযুক্ত থাকা যেমন জরুরী, তেমনি রেলের লাইনের উপর থাকাও জরুরী; বরং প্রথম শ্রেণীর যাত্রীকে টিকেটের টাকাও বেশি দিতে হয়। তাদের একথা বলার অবকাশ নেই যে, 'আমরা প্রথম শ্রেণীর যাত্রী, আমাদের রেল লাইনেরও প্রয়োজন নেই, ভাড়া দেওয়ারও দরকার নেই।" হুযূর-ই আকরাম হলেন চালক-সদৃশ, ইসলাম হচ্ছে রেল লাইন সদৃশ আর আমলগুলো হচ্ছে ভাড়া স্বরূপ।

পরামর্শ-৮.

'আহলে বায়ত' বা নবী-পরিবারের সাথে দু' ধরনের ভালবাসা দেখা যায়। সত্যিকার ভালবাসা ও কৃত্রিম বা মিথ্যা ভালবাসা। সত্যিকার ভালবাসা নাজাতের উপায়। আর মিথ্যা ভালবাসা ধ্বংসের কারণ। খ্রিস্টানরা হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে, ইহুদীরা হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালাম-এর সাথে মিথ্যা ভালবাসার দাবীদার। যেমন- খ্রিস্টানরা বলে, "হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম খোদার পুত্র। তাই তাদের নাকি কোন আমলের প্রয়োজন নেই। হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম শূলীতে চড়ায় তাদের সমস্ত গুনাহর কাফ্ফারা হয়ে গেছে। আর ইহুদীরা হযরত ওযায়র আলায়হিস্ সালামকে আল্লাহর পুত্র মনে করে। (না'ঊযুবিল্লাহ্) তারাও তাঁর প্রতি ভালবাসার দাবী করে খ্রিস্টানদের মতো বলে থাকে। এ মিথ্যা ভালবাসা দ্বারা কেউ তো কখনো মু'মিন হতে পারে না।

আহলে বায়তের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা হচ্ছে- তাঁদের জন্য উৎসর্গীকৃত হয়ে যাওয়া। তাঁদের অনুসরণে তাঁদের মতো আমল করার চেষ্টা করা, নামাযের বেলায় কোনরূপ অবহেলা না করা, সব সময় শোক্র ও সবর করা, তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণকে নিজের জন্য নাজাতের উপায় মনে করা, আশূরার দিনে ও রাতে বেশি পরিমাণে নফল নামায পড়া, দিনে রোযা রাখা, দান-খায়রাত করা

এবং দিনটি ক্বোরআন তিলাওয়াতের মধ্যে অতিবাহিত করা আর সবসময় কাফিরদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকা এবং অনুপযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে কখনো ভোট না দেওয়া। ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইয়াযীদকে ভোট দেননি বরং নিজের মস্তক মুবারক দিয়েছেন। শয়তানী শক্তির সামনে মাথা নত করেননি। আর ইসলামী নিয়ম-কানুন ভঙ্গ হতে দেখলে প্রয়োজনে প্রাণের বিনিময়ে সেগুলো রক্ষা করা, ইসলামের উপর কোনরূপ আঘাত আসতে না দেওয়া, বিপদের সময় ভীত হয়ে না পড়া এবং যে কোন অবস্থায় তাঁদের মতো জীবন-যাপনের চেষ্টা করা- এগুলোই হলো আহলে বায়তের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা।

পক্ষান্তরে, নামায বর্জন করা, ইসলামী চালচলন ও লেবাস-পোশাক পরিত্যাগ করা, আশূরার দিনে বুক চাপড়ানো, বুক ও মাথায় আঘাত করা, তাজিয়া মিছিল বের করা, মাতম করা, শিকল ও ছোরাগুচ্ছ দিয়ে নিজের বুক ও পিঠকে ক্ষত-বিক্ষত করা, এগুলোকে নিজের যাবতীয় গুনাহর কাফ্ফারা মনে করা এবং জান্নাতের টিকেট বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি আহলে বায়তের প্রতি ভালবাসা মোটেই নয়। এগুলো ইয়াযীদ ও ইয়াযীদীদের অনুকরণ মাত্র।

ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতে শিকল-ছোরা ছিলোনা, বরং ছিলো পথভ্রষ্ট ও কাফিরদের বিরুদ্ধে শানিত তরবারি। তিনি নিজের মাথায়, বুকে ও পিঠে আঘাত করেননি বরং আঘাত করেছেন ইয়াযীদের গোমরাহীর উপর। তাঁর মুখে 'হায় হায়' মাতম ছিলোনা, ছিলো পবিত্র ক্বোরআন। তাঁরা আশূরার দিনে খাদ্য বিতরণ করেন, নামায ছেড়ে দেননি। তাই আজ তাঁদের অনুসরণের বিকল্প নেই।

সৈয়্যদ জামা'আত আলী শাহ্ সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুকে জিজ্ঞাসা করা হলো- আজকাল কিছু লোক আশূরার দিনে কোন কোন স্থানে হযরত ইমাম হোসাঈনের কাল্পনিক কফীন তৈরী করে সেটা নিয়ে মিছিল বের করে তাতে বুকে আঘাত করে। তখন তিনি বললেন, "এসব লোক যদি ইয়াযীদের 'কফীন' তৈরী করতো, তাহলে আমিও গিয়ে সেটার উপর দু' চারটা জুতার আঘাত করে আসতাম। তাদের থেকে হিন্দুরা বেশি বুদ্ধিমান (!)। তারা তাদের শারদীয় পূজার সময় দুশমন বামনের মূর্তি বানিয়ে তাতে গুলি চালায়; কিন্তু রামচন্দ্রের 'জানাযা' (কফীন) তৈরী করে না।"

হযরত আমীর-ই মিল্লাতের দরবারে জিজ্ঞাসা করা হলো, সাইয়্যেদগণ দোযখে যাবে কিনা? তিনি জবাবে বলেন, "আল্লাহ্ তা'আলা চান না কোন সাইয়্যেদ দোযখে যাক। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ যদি স্বেচ্ছায় দোযখে লাফিয়ে পড়েন, তাহলে সেটাতো তাঁর মর্জি।"

পরামর্শ-৯.

সাহাবী নন এমন কেউ সাহাবীর সমকক্ষ হতে পারে না। এর প্রমাণাদিও ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আবার যাঁরা সাহাবী এবং হুযূর-ই আক্রামের পবিত্র স্ত্রীগণ ও সকল কন্যা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুন্না আর যাঁরা সাহাবী, কিন্তু আহলে বায়ত নন, যেমন প্রথম তিন খলীফা, মুহাজির ও আনসারীগণ, তাঁরা ওইসব ব্যক্তি থেকে অধিক মর্যাদাশীল, যাঁরা আহলে বায়ত বটে, তবে সাহাবী নন। যেমন হুযূর-ই আক্রামের ওইসব পুত্র, যাঁরা জ্ঞান-বুদ্ধি হবার পূর্বে ইনতিক্বাল করেছেন। কেননা, সাহাবী হওয়া অনেক বড়-নি'মাত। এ কথাগুলো এজন্য বলা হয়েছে যে, আজকাল কিছুলোক বলে বেড়ায় যে, আহলে বায়ত নাকি সাহাবী নন, আবার কোন সাহাবীও আহলে বায়ত নন। তাদের ধারণা হচ্ছে- সাহাবী আলাদা এক জনগোষ্ঠী। যাঁরা হুযূর-ই আক্রামের অতি আপনজন, তাঁরা সাহাবী নন। তারা আরো বলে, হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আহলে বায়ত তথা হুযূর-ই আক্রামের আপনজনদের চেয়ে উত্তম নন; বরং তাঁরা ব্যতীত অন্য সব সাহাবী থেকে উত্তম। এটাও তাদের জঘন্য ভুল ধারণা। বস্তুত: নবীগণের পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্ব রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। দেখুন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম ওফাত শরীফের পূর্বে নিজের মুসাল্লা শরীফে তাঁকে দাঁড় করিয়েছেন এবং নামাযের ইমাম বানিয়েছেন আর এরশাদ করেছিলেন, "যে জনগোষ্ঠীর মধ্যে আবূ বকর সিদ্দীক্ব রয়েছেন, ওই জনগোষ্ঠীতে অন্য কারো ইমাম হবার অধিকার নেই।" বস্তুত: জাতির ইমাম তিনিই হন, যাঁর জ্ঞান-গরিমা ও মান-মর্যাদা সবার চেয়ে বেশী হয়। আল্লাহ্ তা'আলাও হযরত আবূ বকর সিদ্দীক্বকে সর্বাধিক ফযীলতমন্ডিত বলেছেন- وَلاَيَاْتَلِ اُوْلُوْا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ তরজমা: তারা যেন শপথ না করে, যারা তোমাদের মধ্যে মর্যাদাবান ও সামর্থ্যবান। [২৪: ২৫]

এখানে উল্লেখ্য ও লক্ষণীয় যে, فضل (মর্যাদা) শব্দের পর مِنْكُمْ (তোমাদের মধ্যে) আছে; কিন্তু سعة (সামর্থ্য)-এর পর مِنْكُمْ নেই। এ'তে বুঝা গেলো যে,

সিদ্দীক্ব-ই আকবার ফযীলতের দিক দিয়ে সমস্ত সাহাবী ও আহলে বায়তের মধ্যে উত্তম ও উর্ধ্বে; অর্থ ও আর্থিক প্রাচুর্যের দিক দিয়ে নাও হতে পারেন।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এখানে সার্বিক ফযীলতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং আংশিক ফযীলত আহলে বায়তেরও থাকতে পারে। যেমন খাতূনে জান্নাত হযরত ফাতিমা হুযূর-ই আক্রামের 'কলিজার টুকরা', প্রাণপ্রিয়, একান্ত আদূরে ছিলেন। এ সমস্ত বিশেষণ হযরত খাতূনে জান্নাতেরই ছিলো। এটা এভাবে বুঝে নেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম সমস্ত নবী ও রসূল অপেক্ষা সাধারণভাবে ও সার্বিকভাবে শ্রেষ্ঠ। তবে কতেক নবী (আলায়হিমুস্ সালাম)-এর মধ্যে কতেক বিশেষ বৈশিষ্ট্যও আছে। যেমন হযরত আদম আলায়হিস্ সালামকেও ফেরেশতাগণ সাজদা করেছিলেন। তিনি পিতা ও মাতাবিহীন সৃষ্ট হয়েছেন। এগুলো হলো আংশিক ফযীলত।

পরামর্শ-১০

হুযূর-ই আক্রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর পবিত্র স্ত্রীগণের মধ্যে হযরত খাদীজাতুল কুব্রা ও হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা উত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার অনেক বিশেষত্ব রয়েছে। তিনি পবিত্র বিবিগণের মধ্যে অল্প বয়স্কা, সবার চেয়ে বেশি জ্ঞানী। তাঁর নিকট থেকে অনেক হাদীস বর্ণিত। ক্বোরআন-ই হাকীমের জ্ঞানেও তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর বিছানায় হুযূর-ই আক্রামের উপর ওহী এসেছে। হযরত জিব্রাইল তাঁকে সালাম করতেন।

কিছু লোক তাঁর সম্পর্কে মিথ্যা দুর্নাম রটিয়েছিলো। আল্লাহ্ তা'আলা খোদ্ ক্বোরআন-ই করীমে তাঁর পবিত্রতার ঘোষণা দিয়েছেন। হযরত মরিয়মকে যখন লোকেরা অপবাদ দিয়েছিলো, তখন হযরত ঈসা আলায়হিস্ সালাম তাঁর পবিত্রতার পক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, হযরত ইয়ূসুফ আলায়হিস্ সালাম-এর বিপক্ষে যখন অপবাদ দেওয়া হয়েছিলো তখন একটি দুগ্ধপোষ্য শিশু সাক্ষ্য দিয়েছিলো; কিন্তু যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ দেওয়া হলো তখন স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরই বুকের উপর হুযূর-ই আক্রামের ওফাত শরীফ হয়েছে। তাঁরই হুজুরায় হুযূর-ই আক্রাম সমাধিস্থ হয়েছেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত সদয় অবস্থান করবেন।

আর হযরত খাদীজাতুল কুব্‌রা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে যৌবনে পেয়েছেন। তাঁর বর্তমানে হুযূর-ই আক্‌রাম দ্বিতীয় বিবাহ্ করেননি। তিনি হুযূর-ই আক্‌রামের দুর্দিনে একান্ত বিশ্বস্ত ছিলেন। তাঁর সম্পদ দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা হুযূর-ই আক্‌রামকে ধনী করেছিলেন। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন- وَوَجَدَكَ عَآئِلاً فَاَغْنٰى **তরজমা:** (এবং তিনি আপনাকে সম্পদহীন পেয়েছেন, অতঃপর তিনি ধনবান করেছেন। [৯৩:৮] তিনিই হুযূর-ই আক্‌রামের সমস্ত সন্তানের জননী। হযরত ইব্রাহীম ব্যতীত সকল সন্তান তাঁরই গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন। তিনি হুযূর-ই আক্‌রামের পরবর্তী বংশীয় ধারার মূল এবং সমস্ত সাইয়্যেদের মহীয়সী দাদী।

আর হুযূর-ই আক্‌রামের আওলাদের মধ্যে খাতূনে জান্নাত হযরত ফাত্বিমা যাহ্‌রা সর্বাপেক্ষা উত্তম। তিনি সাইয়্যেদুল মুরসালীনের আদরের দুলালী, ওলীগণের সরদার হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর স্ত্রী, শহীদগণের সরদারের মা এবং হুযূর-ই আক্‌রামের পরবর্তী বংশের মূল।

হুযূর-ই আক্‌রাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর সম্মানিত পিতা ও মাতা উভয়ে হুযূর-ই আনওয়ারের নুবূয়ত প্রকাশের পূর্বে ইন্‌তিক্বাল করেন। তাঁরা তাঁদের পবিত্র জীবদ্দশায় নিষ্পাপ মু'মিন ও আল্লাহর দরবারে মাক্ববূল বান্দা ছিলেন। তাঁদেরকে আল্লাহ্ তা'আলা আপন হাবীবের নূরের আমানতদার হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তাঁদেরকে পুনরায় জীবিত করে হুযূর-ই আক্‌রামের সাথে সাক্ষাৎ করান এবং কলেমা পড়িয়ে মুসলমান করান ও তাঁর উম্মতের মধ্যে সামিল করেন। এতদ্‌ভিত্তিতে তাঁরাও সাহাবা-ই রসূলের অন্তর্ভুক্ত।

[ফাতাওয়া-ই শামী]

উপরোক্ত দীর্ঘ আলোচনার উদ্দেশ্য হচ্ছে- রসূলে আক্‌রামের সাহাবীদের প্রতি ভুল ধারণার অবসান করা। হুযূর-ই আক্‌রাম এরশাদ ফরমান, 'যে কেউ অন্য অমুসলমানের ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করে, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন অবমাননা থেকে রক্ষা করবেন।' সুতরাং যে কেউ হুযূর-ই আক্‌রামের একজন সাহাবীর নামে আনীত অপবাদ দূরীভূত করবে, তাকেও নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা দুনিয়া ও আখিরাতে অবমাননা ও লাঞ্ছনা থেকে রক্ষা করবেন। অতএব, হযরত আমীর মু'আভিয়া যেহেতু একজন অতি সম্মানিত সাহাব-ই রসূল, সেহেতু প্রতিটি মু'মিনকেও তাঁর ব্যাপারে অতি সতর্ক থাকতে হবে।

[সূত্র. আমীর মু'আভিয়া পর এক নযর]

প্রত্যেক ঈমানদারের দেখতে হবে, হযরত আমীর মু'আভিয়া সম্পর্কে আমাদের বুযুর্গ ও শীর্ষস্থানীয় মনীষীগণ কি বলেছেন, তাঁরা তাঁর সম্পর্কে কিরূপ ধারণা রাখতেন; কারণ তাঁরা তো যাহেরী ও বাত্বেনী উভয় চোখে দেখতে পান। তাই নিম্নে **কতিপয় মহান বুযুর্গ ব্যক্তির অভিমত** উপস্থাপন করা হলো-

মাযহাবের সম্মানিত ইমাম এবং অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় ওলীগণের অভিমত

ইমাম-ই আ'যম হযরত আবূ হানীফা

রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু -এর

অভিমত

আমাদের ইমামে আ'যম তাঁর তাঁর বিশ্ববিখ্যাত কিতাব 'ফিক্বহে আকবার'-এর ৮৫ নং পৃষ্ঠায়, হযরত সাহাবা-ই কেরাম সম্পর্কে লিখেছেন- نَتَوَلاَّهُمْ جَمِيْعًا وَلاَنَذْكُرُ الصَّحَابَةَ اِلاَّ بِخَيْرٍ অর্থ: আমরা (আহলে সুন্নাত) সমস্ত সাহাবীকে ভালবাসি এবং তাদেরকে প্রশংসা সহকারেই স্মরণ করি।

এর ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী ক্বারী আলায়হির রাহমাহ্ 'শরহে ফিক্বহে আকবার'-এ লিখেছেন-

وَاِنْ صَدَرَ مِنْ بَعْضِهِمْ بَعْضُ مَا صَدَرَ فِىْ صُوْرَةِ شَرٍّفَاِنَّه
كَانَ عَنْ اِجْتِهَادٍ وَلَمْ يَكُنْ عَلى وَجْهِ فَسَادٍ

অর্থ: যদিওবা কোন কোন সাহাবী থেকে এমন কোন বিষয় প্রকাশ পেয়েছে, যা বাহ্যত দেখতে মন্দ মনে হয়, কিন্তু ওইগুলো ইজতিহাদের কারণে ছিলো, ফ্যাসাদ সৃষ্টির কারণে ছিলো না।

সুতরাং এমন কোন হানাফী থাকতে পারে না, যে নিজেকে হানাফী বলে দাবী করে, অথচ আমীর মু'আভিয়া সম্পর্কে কটুক্তি করে স্বীয় ইমামের বিরোধিতা করবে।

আরো লক্ষ্যণীয় যে, সমস্ত ইমামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইমাম-ই আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যে সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে দিয়েছেন, তা সকল মুসলমানের নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়া বাঞ্ছনীয়।

---o---

হযরত আমীর মু'আভিয়া সম্পর্কে হযরত গাউসুল আ'যম শাহানশাহে বাগদাদ

[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

বাণী

ক্বুত্ববে রব্বানী মাহবূবে সুবহানী গাউসুল আ'যম শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তাঁর বিশ্বখ্যাত কিতাব 'গুনিয়াতুত্ তালেবীন'-এর ১৭১ নং পৃষ্ঠায় 'আহলে সুন্নাতের আক্বীদা'র বর্ণনা শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছেন-

وَيَعْتَقِدُ اَهْلُ السُّنَّةِ أَنَّ اُمَّةَ مُحَمَّدٍ خَيْرُ الْاُمَمِ
وَاَفْضَلُهُمْ اَهْلُ الْقَرْنِ الَّذِيْنَ شَاهَدُوْهُ

অর্থ: আহলে সুন্নাতের আক্বীদা হচ্ছে-সমস্ত নবী আলায়হিমুস্ সালাম-এর উম্মতের মধ্যে হুযূর-ই আক্রাম হযরত মুহাম্মদ মোস্তফার উম্মত উত্তম এবং তাদের মধ্যে ওই যুগের লোকেরাই শ্রেষ্ঠ, যাঁরা হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন।

এ অধ্যায়ে খিলাফত সম্পর্কে লিখা হয়েছে-

ثُمَّ وُلِّىَ مُعَاوِيَةُ تِسْعَ عَشْرَةَ سَنَةً وَكَانَ قَبْلَ ذلِكَ
وَلاَّهُ عُمَرُ الْاِمَارَةَ عَلى اَهْلِ الشَّامِ عِشْرِيْنَ سَنَةً

অর্থ: অতঃপর উনিশ বছর যাবৎ আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু খিলাফতে অধিষ্ঠিত থাকেন এর পূর্বে তাঁকে হযরত ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বিশ বছর যাবৎ সিরিয়ার গভর্ণর হিসেবে নিয়োজিত রাখেন।

একই কিতাবের ১৭৫ নং পৃষ্ঠায় হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত আলী ও আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমার মধ্যেকার যুদ্ধ সম্পর্কে এরশাদ করেছেন-

وَاَمَّا قِتَالُه لِطَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ فَقَدْ نَصَّ الْاِمَامُ اَحْمَدُ عَلَى الْاِمْسَاكِ عَنْ ذلِكَ وَجَمِيْعِ مَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ مِنْ مُنَازَعَةٍ وَمُنَافَرَةٍ وَخُصُوْمَةٍ لِاَنَّ اللهَ تَعَالى يُزِيْلُ ذلِكَ مِنْ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا قَالَ عَزَّوَجَلَّ ((وَنَزَعْنَا مَا فِىْ صُدُوْرِهِمْ مِنْ غِلٍّ)) وَلِاَنَّ عَلِيًّا كَانَ عَلَى الْحَقِّ فِىْ قِتَالِهِمْ فَمَنْ خَرَجَ مِنْ ذلِكَ بَعْدُ وَنَاصَبَه حَرْبًا كَانَ بَاغِيًا خَارِجًا عَنِ الْاِمَامِ فَجَازَ قِتَالُه وَمَنْ قَاتَلَه مِنْ

مُّعَاوِيَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْر طَلَبُوْا اثَارَ عُثْمَانَ خَلِيْفَةِ حَقٍّ اَلْمَقْتُوْل ظُلْمًا وَالَّذِيْنَ قَتَلُوْا كَانُوْا فِىْ عَسْكَر عَلِىٍّ فَكُلٌّ ذَهَبَ اِلى تَاوِيْلٍ صَحِيْحٍ

অর্থ: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে সর্বহযরত ত্বালহা, যোবায়র, আয়েশা সিদ্দীক্বা ও আমীর মু'আভিয়া (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম)-এর যুদ্ধ সম্পর্কে ইমাম আহমদ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যেকার পারস্পরিক যুদ্ধ, বিতর্ক ও বিরোধিতা ইত্যাদি নিয়ে বিরূপ মন্তব্য ও বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়া থেকে বিরত থাকা উচিৎ। কারণ আল্লাহ্ তা'আলা তাঁদের ওইগুলো ক্বিয়ামতের দিন দূরীভূত করে দেবেন। যেমন, ((আমি তাদের (জান্নাতীগণ) অন্তর থেকে হিংসা-বিদ্বেষ বের করে দেবো।)) আর এজন্য যে, হযরত আলী মুর্তাদ্বা তাঁদের (ওইসব সাহাবী) সাথে যুদ্ধ করার ব্যাপারে হক্বের উপর ছিলেন। পক্ষান্তরে, যারা তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিয়েছে, তাদের সাথে এ যুদ্ধ তাঁর দিক থেকে বৈধ হয়েছে। আর যেসব সম্মানিত ব্যক্তি, হযরত আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু)-এর সাথে যুদ্ধ করেছেন, যেমন সর্ব হযরত ত্বালহা, যোবায়র, আমীর মু'আভিয়া, তাঁরা হযরত ওসমান (রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রক্তের বদলার দাবী করেছিলেন, যিনি বরহক্ব খলীফা ছিলেন এবং যাঁকে যুল্মবশত: শহীদ করা হয়েছিলো। আর হযরত ওসমানের হত্যাকারীরা হযরত আলীর সৈন্যবাহিনীতে সামিল হয়ে গিয়েছিলো। সুতরাং তাঁদের দাবীও সঠিক ছিলো।

হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর 'গুনিয়াতুত্ব ত্বালেবীন'-এর ১৭৬ নং পৃষ্ঠায় আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর রাজত্ব ও খিলাফত সম্পর্কে যা লিখা হয়েছে, তা নিম্নরূপ-

وَاَمَّا خِلاَفَةُ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِىْ سُفْيَانَ فَثَابِتَةٌ صَحِيْحَةٌ بَعْدَ مَوْتِ عَلِىٍّ وَبَعْدَ خَلْعِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِىٍّ نَفْسَه عَنِ الْخِلاَفَةِ وَتَسْلِيْمِهَا اِلى مُعَاوِيَةَ لِرَاءٍ رَاٰ الْحَسَنُ وَمَصْلَحَةِ عَامَّةٍ تَحَقَّقَتْ لَه وَحِقْنِ دِمَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ

অর্থ: হযরত মু'আভিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ানের খিলাফত ওই সময় থেকে বৈধ হয়েছে, যখন হযরত আলীর ওফাত হয়েছে এবং হযরত হাসান নিজেকে খিলাফত থেকে আলাদা করে নিয়েছেন ও হযরত আমীর মু'আভিয়ার নিকট তা হস্তান্তর করেছেন; তাও একটি সঙ্গত কারণে, যা ইমাম হাসান উপলব্ধি করেছিলেন। আর তাঁর নিকট মুসলমানদের রক্ত রক্ষা করার জন্য সেটাই সঠিক ও সঙ্গত মনে হয়েছিলো।

হযরত গাউস পাক একই কিতাবের ১৭৮নং পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে আহলে সুন্নাতের আক্বীদা তুলে ধরেছেন এভাবে-

وَاتَّفَقَ اَهْلُ السُّنَّةِ عَلى وُجُوْبِ الْكَفِّ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَالْاِمْسَاكِ عَنْ مَسَاوِيْهِمْ وَاِظْهَارِ فَضَائِلِهِمْ وَمَحَاسِنِهِمْ وَتَسْلِيْمِ اَمْرِهِمْ اِلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ عَلى مَاكَانَ وَجرى مِنْ اِخْتِلاَفِ عَلِى وَعَائِشَةَ وَمُعَاوِيَةَ وَطَلْحَةَ وَالزُّبَيْر رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ عَلى مَا قَدَّمْنَا بَيَانَه وَاِعْطَاءَ كُلِّ ذِىْ فَضْلٍ فَضْلَه كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالى : وَالَّذِيْنَ جَاءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا الخ

অর্থ: আহলে সুন্নাতের সবাই এ মর্মে একমত যে, সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে পরস্পরের যুদ্ধের ব্যাপারে বাদানুবাদ করা ও তাঁদেরকে মন্দ বলা থেকে বিরত থাকা ওয়াজিব (অপরিহার্য), তাঁদের ফযীলতসমূহ ও গুণাবলী প্রকাশ করা হবে এবং তাঁদের ব্যাপারটা আল্লাহ্ তা'আলার নিকট সোপার্দ করা হবে, বিশেষত: ওইসব ব্যাপার, যেগুলো ঘটেছিলো, যেমন- ওই মতবিরোধ, যা ঘটেছে হযরত আলী এবং সর্বহযরত আয়েশা, মু'আভিয়া, ত্বালহা ও যোবায়র প্রমুখের মধ্যে, যা আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি। আর প্রত্যেক সম্মানিত ব্যক্তিকে যেন তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয়। কেননা, আল্লাহ্ তা'আলা মু'মিনদের শানে এরশাদ করেছেন, "যে সব মুসলমান ওইসব সাহাবীর পরে আসে, তারা যেন এভাবে বলে, 'হে আমাদের রব, আমাদেরকে ক্ষমা করুন...'।"

আশাকরি, হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর উপরোক্ত বক্তব্য পড়ে ও শুনে সত্যিকার অর্থে কোন মুসলমান ও কোন পীর-মুর্শিদের অনুসারী হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ব্যাপারে কটুক্তি করে নিজের ঈমানকে বিনষ্ট করবেন না।

হুযুর গাউসে পাকের এ ঘটনাও প্রসিদ্ধ, যা ওলামা-ই কেরাম ও দ্বীনের প্রচারকগণ প্রায়শ বলে থাকেন, এক ব্যক্তি হুযূর গাউসে পাককে হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছিলো। তদুত্তরে তিনি বলেছেন, "আমীর মু'আভিয়ার শান অনেক উঁচু। তিনি হুযূর-ই আক্রামের শ্যালক, ওহী লিখক ও বিশিষ্ট সাহাবী।"

তিনি আরো বলেন, "হযরত ওয়াহ্শী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ইসলাম গ্রহণ করে কেবল একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখেছিলেন। তারপর হুযূর-ই আক্রামের নির্দেশে এমনভাবে নির্জনবাসী হয়ে গিয়েছিলেন যে, হুযূর-ই আক্রামের ওফাত শরীফের পর বের হয়েছিলেন।

কোন ওলীর মর্যাদা হযরত ওয়াহ্শী পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না। কেননা, তিনি রসূলে করীমের সাহাবী। সাহাবী সমগ্র জাহানের ওলীগণেরও ঊর্ধ্বে হয়ে থাকেন।"

হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ
[রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু]'র

অভিমত

ওলীকুলের মাথার মুকুট হযরত দাতাগঞ্জে বখ্শ লাহোরী কুদ্দিসা সির্রুল আযীয তাঁর বিশ্বখ্যাত কিতাব 'কাশ্ফুল মাহজূব'-এর ৪৮নং পৃষ্ঠায় আহলে বায়তের অধ্যায়ে হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর প্রসঙ্গে লিখেছেন, "একদিন এক ব্যক্তি ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর দরবারে আসলো এবং আরয করলো, "রসূলে পাকের পবিত্র বংশধরের আমি ছেলেমেয়েধারী একজন অভাবী লোক। আমি আজ রাতের রুটি চাচ্ছি।" তিনি বললেন, "অপেক্ষা করো! আমাদের রিযক্ব এখনো রাস্তায়। তা পৌঁছতে দাও।" এরপর বেশী দেরী হয়নি, আমীর মু'আভিয়ার নিকট থেকে তাঁর খিদমতে পাঁচটি থলে এসে পৌঁছলো। প্রত্যেক থলেতে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রা ছিলো। বাহক খবর দিলো- "আমীর মু'আভিয়া ক্ষমাপ্রার্থী। তিনি বলেছেন, এ সামান্য নযরানা আপনার মা'মূলী প্রয়োজনাদিতে যেন ব্যয় করেন। এরপর আরো বেশি পরিমাণে পেশ করা হবে।" হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ওই ফক্বীরের দিকে ইশারা করলেন এবং থলে পাঁচটি তাকে দান করে দিলেন।

হযরত দাতাগঞ্জে বখশ আলায়হির রাহমাহ্ এ ঘটনার কয়েকটা বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করেছেনঃ

এক. ইমাম হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত ছিলেন। তিনি ভবিষ্যতের খবর দিয়েছিলেন।

দুই. আহলে বায়তের প্রতি আমীর মু'আভিয়ার অগাধ ভক্তি ও ভালবাসা ছিলো। তিনি হযরত হোসাঈন রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর খিদমতে মূল্যবান নযরানা পেশ করতেন। তিনি নিজ কোষাগারের মুখ আহলে বায়তের জন্য খুলে দিয়েছিলেন। এটা নযরানা ছিলো। বার্ষিক 'ওযীফা' (বা ভাতা) তো নির্দ্ধারিত ছিলোই। আমীর মু'আভিয়া ভবিষ্যতে আরো নযরানা অধিক পরিমাণে প্রদানের কথা ঘোষণা দিয়েছিলেন।

তিন. ইমাম হোসাঈন বড় দানশীল ছিলেন। তিনি এত মূল্যবান নযরানা ওই ফক্বীরকে দান করে দিয়েছিলেন।

সুতরাং এমন কোন মুসলমানও আছে কি হযরত দাতাগঞ্জে বখ্শকে মান্য করে, আর আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর অপসমালোচনা করে এবং তাঁর শানে বেয়াদবী করতে পারে? ---o---

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী
[আলায়হির রাহমাহ]'র

অভিমত

ক্বুত্ববে রব্বানী মুজাদ্দিদে আলফে সানী হযরত শায়খ আহমদ ফারূক্বী সেরহিন্দী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু শীর্ষস্থানীয় ওলীগণের একজন। তাঁর লিখিত 'মাকতূবাত' শরীফ : ১ম খন্ডের ৫৪ ও ৮৫ নং পৃষ্ঠায় শায়খ ফরীদকে লিখিত 'মাক্তূব' (চিঠি)-এ লিখেছেন, "বিদ্'আতী সব ফির্ক্বার মধ্যে সর্ব নিকৃষ্ট ফির্ক্বা হচ্ছে সেটা, যারা হুযূর-ই আক্রামের সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা ওই ফির্ক্বাকে কাফির বলেছেন। যেমন- পবিত্র ক্বোরআনে এরশাদ করেছেন- لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ (যাতে কাফিরদের অন্তর্জ্বালা সৃষ্টি হয়। ৪৮: ২৯)

পবিত্র ক্বোরআন ও শরীয়তের প্রচার সাহাবা-ই কেরাম করেছেন। সুতরাং যদি সাহাবা-ই কেরাম ভৎর্সনার পাত্র হন, তাহলে তো পবিত্র ক্বোরআন এবং শরীয়ত ও ভৎর্সনার উপযোগী হয়ে যাবে।

এ মাকতূব শরীফে হযরত মুজাদ্দিদ কুদ্দিসা সিররুহু আরো লিখেছেন, "সাহাবা-ই কেরামের মধ্যে যে যুদ্ধ কিংবা ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, তা মনের কুপ্রবৃত্তির কারণে ছিলোনা। কারণ, সাহাবা-ই কেরামের আত্মাসমূহ হুযূর-ই আন্ওয়ারের পবিত্র সংশ্রবের বরকতে পবিত্র হয়ে গিয়েছিলো এবং যুল্ম-উৎপীড়ন থেকে মুক্ত ছিলো। আমি এতটুকু জানি যে, ওইসব যুদ্ধে হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হক্বের উপর ছিলেন এবং তাঁর বিরোধিতাকারীগণ ভুল ধারণায় ছিলেন। কিন্তু এ ভুলও 'ইজতিহাদী' ছিলো, যা গুনাহ্র পর্যায়ে পড়েনা। তাছাড়া, এখানে দোষারোপ করারও কোন অবকাশ নেই। কেননা, মুজতাহিদ তাঁর ভুলের জন্যও একটা সাওয়াব পান।"

হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর মাকতূবাত শরীফের দ্বিতীয় খন্ডের ৭২ নং পৃষ্ঠায় খাজা মুহাম্মদ নক্বী সাহেবকে লিখিত 'মাক্বতূব'-এ মাযহাবে আহলে সুন্নাতের হাক্বীক্বত সম্পর্কে লিখেছেন-

"সাহাবা-ই কেরাম কতেক ইজতিহাদী বিষয়ে স্বয়ং নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর অভিমতেরও বিপরীত অভিমত দিতেন। তাঁদের এ বৈপরিত্য-দূষণীয়ও ছিলোনা, নিন্দনীয়ও ছিলো না। তাঁদের বিরুদ্ধে এ জন্য কোন ওহীও নাযিল হয়নি। সুতরাং তাঁরা ইজতিহাদ করতে গিয়ে হযরত আলীর বিরোধিতা করে ফেললে তা কুফরী কিভাবে হতে পারে? তা না হলে এ বিরোধিতাকারীদের প্রতি ভৎর্সনা ও নিন্দা করাও কিভাবে বৈধ হতে পারে? বস্তুত: হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে অনেক মুসলমান এবং বিশিষ্ট সাহাবীও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। সুতরাং তাঁদেরকে কাফির বলা কিংবা তাঁদের বিরুদ্ধে অশালীন সমালোচনা করা কোন ছোটখাটো অপরাধ হবে না; বরং كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْ (তাদের মুখ থেকে বড় কথা বের হয়)।"

হযরত মুজাদ্দিদ আলায়হির রাহমাহ্ এ দীর্ঘ মাকতূবে আরো বলেন-"ক্বোরআন শরীফের পর সহীহ্ বোখারী শরীফই প্রধান নির্ভরযোগ্য কিতাব। শিয়া সম্প্রদায়ও একথা স্বীকার করে। শিয়াদের বড় আলিম আহমদ নাইনাতী বলতো যে, সমস্ত কিতাবের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য কিতাব হচ্ছে 'সহীহ্ বোখারী'। ওই কিতাব (সহীহ্ বোখারী শরীফ)-এও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর বিরোধিতাকারীদের রেওয়ায়ত মওজুদ আছে। আর ইমাম বোখারী ও হযরত আলীর পক্ষে ও বিপক্ষে থাকার হাদীসকে 'রা-জিহ্' (অগ্রাধিকার পাবার উপযোগী) কিংবা 'মারজূহ' (অগ্রাধিকার পাবার উপযোগী নয়) বলেন নি। ইমাম বোখারী যেমন হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে রেওয়ায়ত করেছেন, তেমনি হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকেও রেওয়ায়ত নিয়েছেন। যদি ইমাম বোখারীর মতে, হযরত আমীর মু'আভিয়ার মধ্যে কোনরূপ দূষণীয় দিক থাকতো, তাহলে তিনি তাঁর নিকট থেকে বর্ণিত কোন রেওয়ায়ত কখনো গ্রহণ করতেন না এবং তা তাঁর 'সহীহ্' গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করতেন না।"

বিশেষ লক্ষ্যণীয়

হযরত মুজাদ্দিদ আলফে সানী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর ওই 'মাকতূবাত' শরীফে নিজের একটি বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আমার নিয়ম ছিলো যে, আমি হুযূর সাল্লাল্লাহু তা'আলা আরায়হি ওয়াসাল্লাম-এর আওলাদ-ই পাক ও হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর ফাতিহা উপলক্ষে খাবার তৈরী করতাম। একবার আমি স্বপ্নে হুযূর-ই আক্বরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লামকে দেখলাম। আমি সালাম আরয করলাম; কিন্তু হুযূর-ই আক্বরাম এর কোন জবাব দিলেন না এবং আমার দিকে দৃষ্টিপাতও করছেন না। কিছুক্ষণ পর আমাকে এরশাদ করলেন, "আমি আয়েশার ঘরে খাবার গ্রহণ করি। যে আমার কাছে খাবার পাঠাতে চায়, সে যেন আয়েশার ঘরে পাঠায়।" আমি বুঝে গেলাম যে, আমি ফাতিহায় হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বার নাম নিইনি। এরপর থেকে আমি হুযূর-ই আক্বরামের পবিত্র স্ত্রীগণ, বিশেষ করে হযরত আয়েশা সিদ্দীক্বাহ্ রাদ্বিয়াল্লাহু

তা'আলা আনহার নাম উল্লেখ করতে লাগলাম। হুযূর-ই আক্বরামের সকল পবিত্র স্ত্রীও হুযূরের সত্যিকার 'আহলে বায়ত'।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী কুদ্দিসা সিররুহুর উপরোক্ত ঘটনা থেকে হযরত আমীর মু'আভিয়া, হুযূর-ই আক্বরামের পবিত্র স্ত্রীগণ এবং সমস্ত সাহাবী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম সম্পর্কে হযরত মুজাদ্দিদের আক্বীদা সুস্পষ্ট হয়ে গেলো।

সুতরাং যে মুসলমানের অন্তরে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানীর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি থাকবে, সে কখনো হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শানে সামান্যতম বেয়াদবীও করতে পারে না। সুতরাং যে এমনটি করবে সে হযরত মুজাদ্দিদের 'পথ ও মত' থেকে খারিজ হয়ে যাবে। ---o---

হযরত জালাল উদ্দীন রূমী

[রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি]র

অভিমত ও আক্বীদা

হযরত মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমী আলায়হির রাহমাহ্ তাঁর বিশ্বখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'মসনভী শরীফ'-এ হযরত আমীর মু'আভিয়াকে 'আমীরুল মু'মিনীন' ও 'সকল মুসলমানের মামা' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাছাড়া, এ মসনভী শরীফের ১৪নং পৃষ্ঠায় হযরত আমীর মু'আভিয়ার একটি কারামতও বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে- শয়তান একদা তাঁকে নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগাতে এসে তাঁর হাতে ধরা পড়ে গিয়েছিলো। তখন সে তাঁর হাত থেকে পালাতেও পারেনি, তাঁকে ধোঁকাও দিতে পারে নি।

পরিশেষে,

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর সকল সম্মানিত আলিম, ইমাম ও আউলিয়া-ই কেরামের সর্বসম্মত আক্বীদা হচ্ছে, 'হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ও সমস্ত সাহাবী-ই রসূলকে আন্তরিকভাবে সম্মান করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।' তাঁদেরকে সমস্ত উম্মত থেকে উত্তম ও শ্রেয় বলে বিশ্বাস করতে হবে। এখানে ইয়াযীদের প্রসঙ্গ টেনে আনা এবং হযরত আলী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সাথে যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করে তাঁর প্রতি কোন অশালীনতা প্রদর্শন করার কোন অবকাশ নেই। কারণ, তিনি মহান সাহাবী, বড়

মুজতাহিদ ও অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ছিলেন। সুতরাং তাঁর কোন বিষয় আর অপসমালোচনার যোগ্য থাকেনি।

সুতরাং এটাই সরল-সঠিক পথ, যা আমাদের বিজ্ঞ আলিমগণ, ইমামগণ ও আউলিয়া কেরাম অবলম্বন করেছেন। সেটার অনুসরণ করার জন্য আমাদের প্রতি খোদায়ী নির্দেশ এসেছে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন- وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ (তোমরা সত্যবাদীদের সাথে থাকো। ৯:১১৯) আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ ফরমান-(তোমরা এভাবে ফরিয়াদ করো-) اِهْدِنَا الصَّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ (তরজমা: হে আল্লাহ্ আমাদেরকে সোজা পথে পরিচালিত করো; তাদেরই পথে, যাদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো। [সূরা ফাতিহা: আয়াত ৫-৬]

এ আউলিয়া-ই কেরাম হলেন- আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত বান্দাদের অন্যতম। তাঁরা সঠিক ও সরল পথের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁদের পথ সোজা ও সঠিক পথ।

পক্ষান্তরে, হযরত আমীর মু'আভিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে তারাই মন্দ বলে, যারা হয়তো রাফেযী (শিয়া), নতুবা যারা রাফেযী-শিয়াদের সংস্পর্শে র'য়ে অথবা তাদের ভ্রান্ত বইপুস্তক পড়ে কিংবা তাদের দিক থেকে প্রাপ্ত অর্থকড়ির লোভে নিজেদের ঈমানকে ধ্বংস করেছে।

আল্লাহ্ তা'আলা সকল মুসলমানের ঈমান-আক্বীদাকে সংরক্ষণ করার শক্তি-সামর্থ্য ও নিষ্ঠা দান করুন! আমীন।

বিহুরমতে সাইয়্যেদিল মুরসালীন। সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়া 'আলা আ-লিহী ওয়া সাহবিহী আজমা'ঈন।

تَمَّتْ بِالْخَيْر

---সমাপ্ত---